মানব-প্রকৃতি

মানব-প্রকৃতি

(স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ অবলম্বনে রচিত)

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

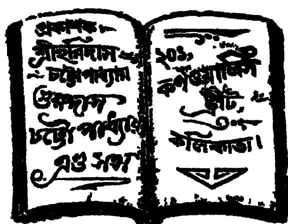
অধ্যাপক, সেণ্ট কলম্বাস্ কলেজ,

হাজারিবাগ।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মূল্য ১৷৷০ টাকা।



প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল
"সিদ্ধেশ্বর প্রেস"
৭৭নং, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গপত্র

মাতৃচরণোদ্দেশে

চুঁচুড়া,
১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮।

বিজ্ঞাপন

বিশ্বজগৎ ও সাহিত্য-জগতের মধ্যে একটী সাদৃশ্য আছে। এই দুই জগৎ-ই সৌন্দর্য্যময়। বিশ্ব-জগতে যেরূপ সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, সাহিত্য-জগতেও সেইরূপ সৌন্দর্য্যের সীমা নাই। দর্শক যেরূপ আপন প্রকৃতি-অনুযায়ী বিশ্ব-সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া আনন্দ অনুভব করে, ভাবুক সেইরূপ আপন প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া সাহিত্য-শোভা সন্দর্শন করে। দর্শক যেরূপ আপন প্রিয় পন্থা ত্যাগ করিয়া অন্যের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্ব-শোভা দর্শন করিতে ভালবাসে না, ভাবুকও সেইরূপ আপন চিন্তালব্ধ ভাব ত্যাগ করিয়া অন্যের ভাব গ্রহণ করত সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে চাহে না।

বিশ্ব-জগতের অনন্ত-সৌন্দর্য্য পণ্ডিতগণ দূরবীক্ষণ-সাহায্যে দর্শন করিয়া যেরূপ আনন্দ পাইয়া থাকেন, বালক নগ্ন-নেত্রে তাহা দেখিয়া প্রায় সেইরূপই আনন্দ পায়; কিন্তু সে আনন্দ প্রকাশ করিবার ভাষা পায় না বলিয়া নৃত্য করিয়া জ্ঞাপন করে। বালকের এই বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের অনুভূতি যেরূপ, সাহিত্য-জগতের দ্বারে দাঁড়াইয়া আমার সেই শোভা-দর্শনের চেষ্টাও তদ্রূপ।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের অমর-গ্রন্থ বিষবৃক্ষ যে ভাবে পাঠ করিয়াছি ও তাহাতে যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, তাহা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম। মানব-চরিত্রের বিভিন্ন অবস্থা ও ক্রমবিকাশ এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম হইল মানব-প্রকৃতি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি মহাশয় ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি তাহাতেই সাহস প্রাপ্ত হইয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করি। আমার সোদর-প্রতিম ছাত্র শ্রীমান্ দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও সহায়তায় এই পুস্তক মুদ্রিত হইল। ভগবান তাহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া উন্নতির পথে লইয়া যাউন।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মানব-প্রকৃতি

সূচনা

জীবজগতে দুইটী মূল প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই প্রবৃত্তির উপর জীবের সর্ব্বত্র অবস্থিতি নির্ভর করে এবং সকল জীবে এই প্রবৃত্তি সমভাবে বর্ত্তমান আছে বলিয়া সর্ব্বকালে তাহাদের অস্তিত্ব আশা করা যায়। এই দুই প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই মানবজাতি উৎকর্ষলাভ করিতেছে ও পৃথিবীর উন্নতি হইতেছে। এই প্রবৃত্তি দুইটীর মধ্যে একটী আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ও অন্যটি আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি।

আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির জন্য মানব কৃষিকার্য্য করিয়া শস্যোৎপাদন করে, বস্ত্রাদি বয়ন করিয়া শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষা করে, গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর আধিপত্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, বিবিধ পীড়ার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তন্নিরাকরণোপায় স্থির করে এবং পরস্পরের সাহায্যে হিংস্র জন্তু দমন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করা সুবিধাজনক মনে করিয়া দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। মানবের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্যই তাহার যাবৎ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। অন্তঃশত্রু হইতে রক্ষার জন্য মানব কৃষিকার্য্য ও আহারোপযোগী জীব পালন করিয়া শরীর পোষণ করে এবং ব্যাধি হইতে মুক্তি-লাভের জন্য ঔষধাদি আবিষ্কার করে। সাধারণতঃ মানুষ আজীবন যত প্রকার কার্য্য করে, তাহা বিচার ও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এই দুই

উদ্দেশ্য সাধিত করাই তাহার প্রধান লক্ষ্য। আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বহিঃশত্রুর কবল হইতে রক্ষার জন্য মানব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে।

মানুষ যতই আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করুক না কেন, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, মানুষকে এই পৃথিবী ছাড়িতেই হইবে; অথচ এই পৃথিবীর প্রতি মানুষের এরূপ মমতা ও আকর্ষণ যে. কেহই এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে না। সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্য এ জগতে আংশিকরূপে থাকিবার জন্য স্বাভাবিক উপায়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। মানুষের এই চেষ্টা ও প্রবৃত্তি সংযত করিবার জন্য এবং সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে বলিয়া বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

উদ্বাহ-সংস্কার স্ত্রী-পুরুষকে কতকগুলি নিয়মাবদ্ধ করিয়া সমাজ হইতে উদ্দাম বিশৃঙ্খলতা ও দুষ্ক্রিয়া দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ এই সকল সামাজিক প্রথা ও নিয়ম পালন করিয়া গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করে, তাহা হইলে সমাজ হইতে অধিকাংশ দুঃখ ও পাপ লোপ পাইতে পারে। কিন্তু মানুষের কাম-প্রবৃত্তি এরূপ প্রবল যে, জাগতিক প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া সংযমাধীন থাকা অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। তখন মোহাবিষ্ট হইয়া অন্যায়াচরণ আরম্ভ করে।

কোন্ কোন্ অবস্থায় মানুষ আত্মসম্মান ও আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া অবৈধ-প্রেমে মুগ্ধ হয়, কিরূপ প্রলোভনে পতিত হইয়া মানুষ পাপে অনুরক্ত হয়, সংযম ও শিক্ষার অভাবে মানুষ অন্যায়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কিরূপ মহাপাপে নিমগ্ন হয়, বাল্যকালে ও যৌবনের প্রারম্ভে কিরূপ শিক্ষা পাইলে দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিয়া পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করিতে পারা যায়, কিংব মানুষ মোহাবিষ্ট হইয়াও কোন্ অবস্থায় চিত্তের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারে—এই সকল বিষয়ই সামাজিক ও সমালোচকের আলোচ্য। এইরূপ

বিষয়ের আলোচনা অতীব চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী এবং ইহাতে সমাজের প্রকৃত উপকার সাধিত হইতে পারে। এই সকল বিষয়ের আলোচনা সহজ ও সুবিধাজনক করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের এক বা ততোধিক ভাব উপজীব্য করিয়া সমাজের মঙ্গলার্থে উপন্যাস লিখিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ এই শ্রেণীর একখানি সামাজিক উপন্যাস। মানব-প্রকৃতির মূলতত্ত্বগুলি অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। যে প্রবৃত্তি দমন করিতে পারিলে মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে এবং যাহা অসংযত অবস্থায় মানুষকে পশুভাবাপন্ন করিয়া অতি ঘৃণ্য করিয়া দেয়—তাহা বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহা আমরা প্রত্যহ দেখি, যে সকল মহাপাপের কথা আমরা অনেক সময় শুনিতে পাই, সেই সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়া মানবচরিত্রের বৈচিত্র এরূপভাবে লিখিত হইয়াছে যে, বাস্তব-জগতের ছবি সময়ে সময়ে আমাদের নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠে। এই পুস্তকে মোহের উপর সংযমের প্রভাব, পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয়, পাপীর তাপ ও পুণ্যাত্মার সুখ দেখান হইয়াছে বলিয়া ইহা চির-সুন্দর, চির-নূতন।

বিষবৃক্ষ পাঠ করিলে সহজেই তাহার বহিরঙ্গ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু অন্তরঙ্গ বুঝিতে হইলে ধৈর্য্য ও শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিতে হইবে। নিভৃতে বসিয়া মানবজীবনের মূল তত্ত্বগুলি অনুশীলন করিতে হইবে এবং মানব-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। কেবল সংসারের পবিত্র ও সুখময় দৃশ্য দেখিয়া নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত করিলে চলিবে না—সংসারের কুটিলতা, নীচতা, হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রী-কাতরতা এবং তাহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, এবং ইহা হইতে যে অনন্ত দুঃখের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা অনুভব করিতে হইবে। সততা ও সরলতার লাঞ্ছনা এবং পাপের উৎকর্ষ দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হইবে। তখন মানবজীবনের উৎকট-রহস্য

অনুধাবন করিতে পারা যাইবে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে জীবনব্যাপী যুদ্ধ চলিতেছে, তাহা তখন প্রতিভাত হইয়া উঠিবে। তখন দেখিতে পাইবে—ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সংযম প্রলোভন, সরলতা কুটিলতা, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ হইতেছে এবং প্রতি-মুহূর্ত্তেই একের জয়—ও অন্যের পরাজয় হইতেছে। এই মহা আহবে যাহারা দিনের পর দিন জয়লাভ করিতেছে, তাহাদেরই জীবন ধন্য, মনুষ্যজন্ম সার্থক; তাহাদের সংসার অনন্ত সুখশান্তির আকর; বিবাহ ও প্রেম তাহাদের সংসারের মূলভিত্তি—সংযম ও ধর্ম্মবুদ্ধি তাহার বন্ধন। আর যাহারা এই যুদ্ধে কেবলই পরাজিত হইতেছে, তাহাদের জীবনে ধিক্; মানবজন্ম বৃথা। তাহারাই মানবরূপে রাক্ষস এবং তাহারাই সংসারের অধিকাংশ দুঃখকষ্টের কারণ।

বিষবৃক্ষে এইরূপ সার্থক পবিত্র জীবন ও ব্যর্থ কলঙ্কিত জীবনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সে চিত্র দর্শন করিলে পবিত্রতার উজ্জ্বল বর্ণে ও ধর্ম্মের আলোকে তোমার চক্ষু স্নিগ্ধ হইয়া যাইবে; পাপের ম্লানবর্ণ তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে না, অথচ সর্ব্বত্রই তাহার হীনতা বুঝিতে পারিবে। তখনই তোমার বিষবৃক্ষ-পাঠ সফল হইবে এবং স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের আশা—"ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে"—পূর্ণ হইবে।

পুরুষ-প্রকৃতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পুরুষের সহৃদয়তা

গোবিন্দপুরের জমীদার নগেন্দ্র দত্ত সূর্য্যমুখী-গত প্রাণ। পতিব্রতা স্ত্রীর উপযুক্ত স্বামী। পতিব্রতা স্ত্রীর চিত্ত যেরূপ স্বামীর চিন্তায় সতত ব্যাপৃত থাকে এবং প্রতি গৃহ-কর্ম্মে যেরূপ স্বামীর অবস্থিতি অনুভব করে, নগেন্দ্রনাথ সেইরূপ সকল অবস্থাতেই স্ত্রীর উপদেশ ও অনুরোধ স্মরণ করিতেন। যখন তিনি জলপথে কলিকাতা যাত্রা করিতেছিলেন, তখন স্ত্রী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন—"দেখিও, নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝড়ের সময় কখনও নৌকায় থাকিও না।" সূর্য্যমুখীর অনুরোধ তাঁহার চিত্তে জাগরূক ছিল বলিয়াই আকাশে মেঘ দেখিয়া তিনি নাবিকদিগকে বলিলেন—"নৌকাটা কিনারায় বাঁধিও।"

নৌকা কিনারায় লাগিলে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সূর্য্যমুখীর নিকট স্বীকৃত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়াও তিনি সহসা নৌকা হইতে অবতরণ করিতে পারিলেন না। দুর্ব্বল-চিত্তবশতঃ অন্যে কি ভাবিবে, ইহাই মনোমধ্যে আলোচনা করিতেছিলেন; এমন সময় নাবিক তাঁহাকে নৌকা হইতে নামিবার জন্য অনুরোধ করিল। নগেন্দ্রনাথ নামিলেন এবং স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিলেন। তাঁহার দুর্ব্বল-চিত্তের পরিচয় তিনি এইরূপে দিলেন, কিন্তু সে চিত্ত যে কত দুর্ব্বল, তাহা নাবিকের এই অযাচিত অনুরোধের জন্য বুঝিতে পারা গেল না।

প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে নদী-তীরে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব মনে করিয়া সিক্তাবস্থায় নগেন্দ্রনাথ গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং অন্ধকারের মধ্যে অতিকষ্টে জলপ্লাবিত ভূমি অতিক্রম করিয়া গ্রামের প্রান্তস্থিত এক গৃহস্থের অতি প্রাচীন বাস-ভবনে উপস্থিত হইলেন। দ্বারমধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আরামে রাত্রি-যাপনের আশা বিদূরিত হইল। সৌষ্ঠবহীন দারিদ্র্যব্যঞ্জক ভগ্ন গৃহ-মধ্যে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত এক বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। ইহা দেখিয়াও তিনি অন্য আশ্রয়ের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন না। কোমলহৃদয় নগেন্দ্রনাথ গৃহস্বামীর পূর্ব্বসম্পদ লক্ষণ ও বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে তাঁহার চরমকালিক কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য দ্বারপার্শ্বে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

ধনী নগেন্দ্রনাথ বিপন্নাবস্থায় বাধ্য হইয়া আশ্রয়লাভার্থ দরিদ্র-গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরদুঃখকাতর মহান্ হৃদয় তাঁহাকে তথায় অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছিল। গৃহস্বামী ও তাঁহার কন্যার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া তিনি সেই মহাপ্রস্থানোন্মুখ বৃদ্ধের দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ের কাতরতা দর্শন করিতেছিলেন। যে চিন্তা গৃহস্বামীকে সেই অন্তিম-কালেও ক্ষুব্ধ ও পীড়িত করিতেছিল, বাক্যে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হওয়ায় যে অন্তর্যাতনা দীর্ঘনিশ্বাস ও অবিরল-প্রবাহিত অশ্রুধারায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নগেন্দ্রনাথকেও ব্যথিত করিল। সহায়সম্পদবিহীনা কুমারী কুন্দনন্দিনীর রক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে তিনি মনস্থ হইলেন।

অল্পক্ষণমধ্যে বৃদ্ধের বাক্যস্ফূর্ত্তি অস্পষ্টতর হইল; নিশ্বাস কণ্ঠগত হইল এবং প্রাণবায়ু দেহাবরণ ত্যাগ করিয়া অনন্তে মিশাইয়া গেল। তখন নগেন্দ্রনাথ মৃতের সৎকারের জন্য লোক-সংগ্রহার্থ নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

তখনও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল। অবিরল জলধারায় পরিসিক্ত

হইয়া নগেন্দ্রনাথ তথায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। স্বীয় কষ্ট সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া তিনি সেই অপরিচিতা বালিকার বিপন্মোচনের জন্য অন্ধকারের ভিতর দিয়া ভিজিতে ভিজিতে গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলেন। লোক সংগ্রহ করিয়া ও সকল ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করিয়া নগেন্দ্রনাথ মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। তাঁহার এই পরহিতাকাঙ্ক্ষা ও সদয়-ব্যবহার হইতে প্রজাপালক ধনাঢ্য জমীদারের চরিত্র সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

প্রাপ্তবয়স্কা কুন্দনন্দিনীর ভরণ-পোষণ ও বিবাহের ব্যবস্থার জন্য নগেন্দ্র-নাথ গ্রামমধ্যে তাহার আত্মীয়ের অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন যে গ্রামমধ্যে তাহার কোন আত্মীয় নাই, তখন এই রক্ষকহীনা বয়স্থা কন্যার অভিভাবক হইবার চিন্তামাত্রও না করিয়া গ্রামবাসীদিগকে অনুরোধ করিলেন—"তোমরা উহাকে কেহ গ্রহণ কর, উহার বিবাহ দিও, তাহার ব্যয় আমি দিব। আর যতদিন সে তোমাদিগের বাটিতে থাকিবে, ততদিন আমি তাহার ভরণ-পোষণের ব্যয়ের জন্য মাসিক কিছু কিছু টাকা দিব।"

গ্রামবাসীদিগের মধ্যে কেহই তাহাদের পরিচিত এই কন্যার ভার গ্রহণ না করায়, নন্দ্রেনাথ কিঞ্চিৎ বিপন্ন হইলেন। তখন সেই পল্লীবাসী একজনের উপদেশানুসারে তিনি এই অপরিচিতা কুমারীকে তাহার মাসীর বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে করিয়া কলিকাতা লইয়া গেলেন।

কলিকাতায় গিয়া নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর মেসো মহাশয়ের অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাঁহার কোন সন্ধান না পাওয়ায়, তিনি কুন্দকে স্বীয় ভগ্নী কমলমণির বাড়ীতে রাখিলেন। ইচ্ছা রহিল, কলিকাতার কার্য্য সমাপনান্তে যখন তিনি স্বদেশ গোবিন্দপুরে যাইবেন, তখন কুন্দকে তথায় লইয়া যাইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ*

সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ

নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্য্যে বিস্মিত হইলেন। অপ্রাপ্ত-যৌবনা কামিনীর হৃদয়ে শিশুর সারল্য দেখিয়া, তাহার অন্তরের বিশুদ্ধভাব ও সংসারের অনভিজ্ঞতা দেখিয়া, স্ত্রীজন-সুলভ ভীতিভাব ও চিত্তের ঈষৎ চাঞ্চল্যহেতু অশ্রুবিমোচন দেখিয়া, নগেন্দ্রনাথ তাহাকে অপার্থিব বস্তু মনে করিলেন। আবার তাহার বহিঃ-সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া, উৎপলদল-মধ্যস্থিত বিকশিতপ্রায় কমলিনীর ন্যায় কুন্দনন্দিনীর অযত্নরক্ষিত কেশ-কলাপ-বেষ্টিত সুচারু মুখখানি দেখিয়া, স্বল্পাভরণযুক্ত মৃণালনিন্দিত সুগোল বাহুযুগল দেখিয়া এবং সর্ব্বোপরি তাহার গঠনের মধ্যে অন্তরের শান্তির বিকাশ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

মুগ্ধান্তঃকরণে নগেন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধু হরদেব ঘোষাল ও পত্নী সূর্য্যমুখীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কুন্দনন্দিনীর রূপ নগেন্দ্রের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। সেই রূপসীর রূপে তাহার চিত্ত যে কতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহা সূর্য্যমুখী পত্রোত্তরে স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"একটী বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে?......আর যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি বরণডালা সাজাইতে বসি।"

সূর্য্যমুখীর পত্রে নগেন্দ্রনাথের চরিত্রসম্বন্ধে আর একটি আভাস পাওয়া যায়। পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর অন্তর ও বাহির অতি স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পান। পতির মঙ্গলে নিজের মঙ্গল মনে করিয়া তিনি সততই পতির শুভকামনা করিয়া থাকেন এবং আবশ্যক বোধ করিলে উপদেশ দিয়া

থাকেন। সূর্য্যমুখী স্বামীকে লিখিলেন—"কলিকাতায় বিলম্ব করিও না, কলিকাতায় না কি ছয়মাস থাকিলে মনুষ্য ভেড়া হয়।" রূপ-যৌবনশালী নগেন্দ্রনাথ যে কলিকাতার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রলোভনে পতিত হইতে পারেন, এ আশঙ্কা সূর্য্যমুখীর অন্তঃকরণে বর্ত্তমান ছিল।

কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রনাথের সংসারে আনীতা হইয়া সূর্য্যমুখীর আশ্রিত-ভ্রাতা তারাচরণের সহিত পরিণীতা হইল। নবযৌবন-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্ব্বাঙ্গে এক অমানুষী সৌন্দর্য্যপ্রভা ফুটিয়া উঠিল। সেই অপূর্ব্ব সুষমা-মণ্ডিতা হইয়া কুন্দনন্দিনী তিন বৎসরকাল তারাচরণের গৃহে অবস্থিতি করিল, কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে চতুর্থ বৎসরে সে বিধবা হইল।

বিধবা হইলে সূর্য্যমুখী কুন্দনন্দিনীকে আপন সংসারে আনিয়া স্বীয় পরিবারভুক্তা করিয়া রাখিলেন। যখন কুন্দ সূর্য্যমুখীর সংসারে আসিল, তখন তাহার পূর্ণ-যৌবন; তাহার রূপরাশি অধিকারিণীর অজ্ঞাতসারে উজ্জ্বলতর হইয়া মোহিনী ও আকর্ষণী শক্তিতে সেই পুরবাসিনীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল।

নগেন্দ্রনাথ কুন্দের সেই অতুল রূপরাশি দেখিলেন। সেই কুসুম-কোমলা যুবতীর আশৈশব দুঃখের চিন্তা তাঁহার হৃদয় সহানুভূতিপূর্ণ করিল। তাহার অনাথিনীত্ব ও বৈধব্যের বিষয় মনোমধ্যে সর্ব্বদা আলোচনা করায়, কুন্দনন্দিনীর চিন্তা প্রথমে তাঁহার চিত্ত অধিকার করিল। আশ্রয়রহিতা কুন্দকে যখন তিনি স্বগৃহে আনিয়াছিলেন, তখন তাঁহার আশা ছিল যে ভবিষ্যতে কুন্দ সুখী হইতে পারিবে। তাঁহার অর্থ-সাহায্যে ও সূর্য্যমুখীর আনুকুল্যে কুন্দনন্দিনী স্বামীর সহিত সুখে সংসার করিতে পারিবে মনে করিয়া, তিনি কমলমণির নিকট হইতে কুন্দকে লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বৈধব্যের সঙ্গে সঙ্গে যখন সকল সুখ অন্তর্হিত হইল, তখন কুন্দনন্দিনীর শুষ্ক মুখ দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ ব্যথিত হইলেন। তাহার সুখোৎ-

পাদনের কোন উপায় থাকিলে স্বীয় সুখ বিসর্জ্জন দিয়া তৎসাধন-প্রবৃত্তি তাঁহার হইল। দৈবক্রমে সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুর মধ্যে বাল-বিধবার বিবাহ-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেন এবং বিধবার বিবাহ যে শাস্ত্রসঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত, তাহা প্রতিপন্ন করিলেন। এই সংবাদ নগেন্দ্রনাথের চিত্তমধ্যে এক নূতন চিন্তা-স্রোত উত্থিত করিল।

যেহেতু বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত এবং অনেক পণ্ডিত যখন ইহার অনুমোদন করিতেছেন, তখন কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কাহার সহিত বিবাহ দিলে কুন্দ প্রকৃত সুখী হইতে পারে? এ চিন্তা যখন নগেন্দ্রনাথের মনোমধ্যে উদিত হইল তখনই তিনি ভাবিলেন, কে কুন্দকে আমার অভিলাষানুরূপ সুখে রাখিতে পারিবে? আমি সূর্য্যমুখীকে যেরূপ সুখে রাখিয়াছি, সেইরূপ সুখে কুন্দকে কে রাখিতে পারিবে? যতই নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর দুঃখের প্রতীকার চিন্তা করিতে লাগিলেন, যতই তিনি কুন্দনন্দিনীর নাম মনে এবং মুখে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার চিত্ত সেই কামিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন কুন্দের যৌবনসুলভ অনুপম রূপরাশি, তাহার অনন্যসাধারণ কমনীয়তা, সরলতা ও স্থির ধীর ভাব, সেই নির্জ্জন-বিকশিত-কুসুমের স্বশরীরের প্রতি বিতৃষ্ণা ও সুখে পরাঙ্মুখতা তাঁহাকে সূর্য্যমুখীর বন্ধন হইতে বিচ্যুত করিল। তিনি স্থির করিলেন, যদি কুন্দের বিবাহ দিতে হয়, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং কেন না তাহাকে বিবাহ করেন। অবলা-প্রিয়, সৌন্দর্য্যলোলুপ, আসক্তিপূর্ণ পুরুষের যে ভাব স্বাভাবিক, নগেন্দ্রনাথের তাহাই হইল। তিনি কুন্দকে স্বীয় প্রেমময়-হৃদয়ে স্থান দিতে আরম্ভ করিলেন এবং নূতনের অভ্যুদয়ে পুরাতন অল্পে অল্পে হৃদয় হইতে অপসৃত হইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহ

মানব-হৃদয়ে প্রণয় এক বিচিত্র শক্তি। প্রণয় যখন প্রথমাবস্থায় মোহ-রূপে থাকে, তখন চিত্তকে এরূপ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে, লোভনীয় পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছুই গোচরীভূত হয় না। বিশেষতঃ যাহাদের চিত্ত সংযত হয় নাই বা যাহারা সংযম অভ্যাসের অবসর পায় নাই, তাহারা মোহাচ্ছন্ন হইলে প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বীয় কার্য্যের বিচার করিতে পারে না। মানব-প্রকৃতিতে ইহাই পশুভাব, কিন্তু পশুত্বের সহিত মনুষ্যত্বের প্রভেদ এই যে, মনুষ্য এই অবস্থাতেও সম্পূর্ণ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয় না। লজ্জা, অপমানভয়, সমাজভয় প্রভৃতি সকল গুণ তখনও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া মনুষ্যকে মোহ হইতে রক্ষা করে।

নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে হৃদয়ে স্থান দিলেন, কিন্তু পাছে সূর্য্যমুখী তাঁহার এই চিত্ত-পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারেন, সেই ভয়ে তিনি অধিকতর সাবধানতার সহিত সংসারমধ্যে থাকিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে কুন্দনন্দিনী তাহার নয়নপথে পতিত না হয়, তজ্জন্য তিনি সতর্ক থাকিতেন; অথচ সূর্য্যমুখীর অলক্ষ্যে সেই কুন্দনন্দিনীর অনুসন্ধানের জন্য তাঁহার নয়নদ্বয় ব্যগ্র হইয়া ইতস্ততঃ ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিত। তিনি কুন্দের নাম সহজে মুখে আনিতেন না, অথচ অন্যমনস্ক হইয়া দাসী কুমুদকে ডাকিতে গিয়া কুন্দের নামোচ্চারণ করিতেন এবং মুখ হইতে কুন্দ শব্দ নির্গত হইবামাত্র অত্যন্ত লজ্জিত হইতেন। সূর্য্যমুখীর প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া গর্হিত ও লজ্জাজনক—এই ধারণা থাকায় তিনি কুন্দনন্দিনীর চিন্তা হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন, অথচ তিনি এরূপভাবে প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, নিষ্কৃতিলাভ তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া

উঠিয়াছিল। যখন নগেন্দ্রনাথ কুন্দগতপ্রাণ হইলেন, তখন সূর্য্যমুখীর বিশ্বাস হারাইবার ভয়ে তিনি তাঁহাকে অধিকতর যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাধ্বী স্ত্রী সূর্য্যমুখী স্বামীর অকপট প্রেমলাভে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার চিত্ত-পরিবর্ত্তন স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্বামীর চিত্তবৃত্তি পতিব্রতা, পতিপ্রাণা স্ত্রীর নখদর্পণে থাকে জানিয়াও নগেন্দ্রনাথ মোহবশতঃ সূর্য্যমুখীর নিকট হইতে স্বীয় মনোভাব প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

পতি-বৎসলা সূর্য্যমুখী স্বামীর মনোভাব বুঝিতে পারিলেন; এবং তিনি যে প্রিয়তমের অঙ্ক হইতে ক্রমশঃ বিচ্যুত হইতেছেন, তাহাও জানিতে পারিলেন। পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় তিনি স্বামীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়াও অন্তরে কোন সন্দেহ পোষণ করিলেন না; এবং স্বামীর চিত্ত-পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না। পাছে স্বামীর চিত্ত-প্রতি অবিশ্বাসিনী হইতে হয়, এই ভয়ে তিনি স্বামীকে তখনও নিষ্পাপ ও অনাবিল ভাবিয়া অধিকতর স্নেহে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

পুরুষ-প্রকৃতির যেটি প্রধান অঙ্গ, সে সম্বন্ধে সূর্য্যমুখীর কোন ধারণা ছিল না। পুরুষ যত কর্ম্মপ্রাণ বা সংযত হউক না কেন, সকলেরই এমন সময় আসে, যখন কর্ম্ম বা কর্ম্মচিন্তা হইতে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। সেই বিশ্রামকাল সুখকর করিবার জন্য বা ভবিষ্যৎ কর্ম্মের উপযুক্ত শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য সখীরূপিণী স্ত্রীর সাহচর্য্য এবং প্রণয়ের আবশ্যক হয়। স্ত্রীর সোহাগ, আদর, রহস্য ও প্রণয় এইরূপ শ্রান্তির সময় প্রকৃত সুখোৎপাদন করে; এবং তদ্দ্বারা স্ত্রী স্বামীর অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে আপন প্রেমপাশে বদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু যদি এরূপ সময় স্ত্রীর প্রণয়-সম্ভাষণাদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটা অবসাদ আসে, এবং স্বামী সেবাপরায়ণা স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে প্রণয়বন্ধন ছিন্ন করিতে থাকে।

সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথের সেবা করিতেন। স্ত্রীর আদর ও সোহাগ

ভোগ করিতে না পাওয়ায় স্বামীর কর্ম্মক্লিষ্ট হৃদয় যে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, তাহা সরলা সূর্য্যমুখী বুঝিতে পারেন নাই। যখন তিনি স্বামীর চিত্ত-পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলেন, তখনও স্বামীর মনে সুখোৎপাদনের চেষ্টা না করিয়া প্রবীণা গৃহিণীর মত স্বামীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ যে মানসিক ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, শারীরিক অসুস্থতা দূরীকরণ-সমর্থ ঔষধে যে তাহার কোন প্রতীকার হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং, যখন সূর্য্যমুখী স্বামীর রোগ-শান্তির জন্য ঔষধ আনাইয়া স্নেহভরে স্বামীকে সেবন করাইতে গেলেন, তখন নগেন্দ্রনাথ ঔষধের শিশি হস্তে লইয়া একটা বিড়ালকে ছুড়িয়া মারিলেন ; শিশি ভাঙ্গিয়া গেল।

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "ঔষধ না খাও ত তোমার কি অসুখ আমাকে বল।" নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কি অসুখ ?"

নগেন্দ্রনাথ আর কিছুই বলিলেন না। সূর্য্যমুখীকে ইহা অপেক্ষা অধিক বলিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। যদি সূর্য্যমুখী তখনও স্বামীর চিত্তের একাংশও অধিকার করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে নগেন্দ্রনাথ বলিতেন, "কি অসুখ ? তুমি আমার স্ত্রী, তুমি কি বুঝিতে পার না আমার কি অসুখ ? আমি পুরুষ-মানুষ, আমার কত আকাঙ্ক্ষা। সে সকল আকাঙ্ক্ষা কেবল তুমিই পরিতৃপ্ত করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি কি তাহা পূর্ণ করিবার জন্য একদিনও চেষ্টা করিয়াছিলে ? নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া তখন বুঝিতে পারিতাম না সে আকাঙ্ক্ষা কত বেশী, কত প্রবল। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, সেই সকল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বিরাট আকার ধারণ করিয়া পরিতুষ্ট হইবার জন্য আমাকে অন্যপথে লইয়া চলিয়াছে। আমি চেষ্টা করিয়াও ফিরিতে পারিতেছি না। তুমি ইহা দেখিয়াও ত দেখিতেছ না।"

সরলা সূর্য্যমুখী স্বামীর মনোভাব বুঝিতে পারিলেন না। এত সেবা করিয়াও যে তিনি স্বামীর চিত্তে স্ফূর্ত্তি আনিতে পারিতেছেন না, এত যত্ন করা সত্ত্বেও যে তাঁহার স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, তুমি চেষ্টা না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা অসম্ভব। কিন্তু একখানি দর্পণ হস্তে লইয়া মুখে বলিলেন, "তোমার শরীর দেখ দেখি কি হইয়াছে?"

নগেন্দ্রনাথের সম্মুখে সূর্য্যমুখী দর্পণ ধরিলেন। নগেন্দ্রনাথ সেই দর্পণে স্বীয় বহিরবয়বের প্রতিবিম্ব না দেখিয়া তথায় অন্তঃপ্রকৃতি প্রতিফলিত হইতে দেখিলেন। সাধ্বী পতি-প্রাণা স্ত্রীর সম্মুখে নিজেকে একজন কপটাচারী, পরস্ত্রী-পরায়ণ, ব্যভিচারীরূপে দেখিতে পাইলেন। লজ্জায়, ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া, নিজের অসংযত জীবনের উপর বিরক্ত হইয়া, স্ত্রীকে স্বীয় অবনতির একমাত্র কারণ স্থির করিয়া, সেই অনুশোচনা-উদ্দীপনকারী দর্পণ দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

সূর্য্যমুখী স্বামীহস্তে এইরূপ লাঞ্ছিত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিলেন। ইহা দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ ভাবিলেন—যতদিন প্রতীকারের উপায় ছিল, ততদিন তুমি আমার দিকে চাহিয়া দেখ নাই, আর যখন আমি আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য প্রলোভন-স্রোতে শরীর ও মন ভাসাইয়াছি, তখন তুমি ফিরাইতে আসিলে! তুমি কি কখনও ভাব নাই যে পুরুষের চিত্তে একবার দুর্দ্দমনীয় ভোগাকাঙ্ক্ষা জন্মিলে সে চিত্ত আর সংযত করিতে পারা যায় না? সময় থাকিতে যখন কোন চেষ্টা হয় নাই, তখন এই অসময়ে তাঁহাকে সৎপথে আনিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে মনে করিয়া নগেন্দ্রনাথ স্ত্রীর উপর রুষ্ট হইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তিনি এরূপ রুষ্ট হইয়া বাহিরে আসিলেন যে, ক্রোধান্ধ হইয়া বিনা অপরাধে একজন ভৃত্যকে প্রহার করিলেন। তাঁহার শান্তস্বভাব ক্রমশঃ

কক্ষ হইয়া উঠিল। যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারায় এবং স্ত্রী সূর্য্যমুখীর দ্বারা তাহার পরিতৃপ্তি অসম্ভব মনে হওয়ায়, তিনি সর্ব্বদা ক্রোধায়ত্ত হইয়া থাকিতেন। আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার সহিত লজ্জা ও ভদ্রতার সংঘর্ষে যে অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে নগেন্দ্রনাথ অহরহঃ দগ্ধ হইতেছিলেন। সে অন্তর্দাহ অধিক দিন সহ্য করিতে না পারিয়া উপশমের জন্য তিনি মাদকরূপী পানীয় ব্যবহার আরম্ভ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোহের প্রভাব

পূর্ব্বে নগেন্দ্রনাথ সন্ধ্যার পর নির্দ্ধারিত সময়ে অন্তঃপুরে আসিয়া আহার করিতেন। একদা নিরূপিত-সময়ে অন্তঃপুরে না আসায় স্বামীর প্রতীক্ষা করিয়া সূর্য্যমুখী তাঁহার আহার্য্য লইয়া অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়াছিলেন, এমন সময় নগেন্দ্রনাথ আরক্তমুখে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্বামী মদ্যপান করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া, সূর্য্যমুখী বিস্মিতা হইলেন। ইতিপূর্ব্বে স্বামীর চরিত্র-দোষ-সূচক কোন ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই। যখন সূর্য্যমুখী স্বামীর চিত্ত-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তখনও তিনি গর্ব্বভরে স্বামী-সম্বন্ধে কমলমণিকে লিখিয়াছিলেন—"তিনি ধর্ম্মাত্মা, শত্রুতে তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না।" কিন্তু তাঁহার সে গর্ব্ব আজ নগেন্দ্রনাথ চূর্ণ করিলেন। ধর্ম্মানুরাগী চরিত্রবান্ নগেন্দ্রনাথের এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া সূর্য্যমুখী বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন।

দিনের পর দিন এই ভাবেই কাটিতে লাগিল। প্রত্যহই মদ্যপান

করিয়া নগেন্দ্রনাথ অধিক রাত্রে অন্তঃপুরে আসিতে লাগিলেন দেখিয়া সূর্য্যমুখী অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন। এ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিতে তাঁহার সাহস হইত না। কিন্তু স্বামীর এ গর্হিত কার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া, একদিন সূর্য্যমুখী কোনরূপে অশ্রু সংবরণ করিয়া স্বামীর চরণে হাত দিয়া বিনয়-সহকারে বলিলেন, "কেবল আমার অনুরোধে ইহা ত্যাগ কর।"

ইহাতে নগেন্দ্র অপ্রতিভ বা লজ্জিত না হইয়াই উত্তর করিলেন—"কি দোষ?" যদি মত্ততার জন্য নগেন্দ্রনাথ মদ্যপান আরম্ভ করিতেন, কিংবা যদি সংসর্গদোষে এ অভ্যাস অর্জ্জন করিতেন, তাহা হইলে সাধ্বী স্ত্রীর নিকট প্রথম প্রথম নিশ্চয় লজ্জিত হইতেন; এবং মদ্যপান ত্যাগ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি কখনই রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না— "কি দোষ?"

যৌবনের অদম্য প্রবৃত্তি ও অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় এখন তাহা শতগুণ বর্দ্ধিতায়তন হইল। পূর্ণ-যৌবনা কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়া অবধি তাঁহার মনে হইতেছিল যে, এরূপ যুবতীর দ্বারা তাঁহার অতৃপ্ত বাসনাগুলি মিটিতে পারে। কিন্তু কুন্দনন্দিনীকে লাভ করা কি সম্ভব? কুন্দ বিধবা। তাহার নিকট এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করা অভদ্রোচিত; সুতরাং শিক্ষিত ভদ্রসন্তান নগেন্দ্রনাথ এ কার্য্য কখনও করিতে পারেন না। যে কুন্দ পিতৃহীনা হইয়া নগেন্দ্রনাথকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সহিত স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, আজ তাহারই কাছে বিশ্বাসঘাতক হইয়া কি করিয়া তিনি তাঁহার কু-অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবেন। পবিত্র-প্রণয়শালিনী, আত্মত্যাগ-তৎপরা পতি-প্রাণা সূর্য্যমুখীর সম্মুখে তিনি কি করিয়াই বা চরিত্রহীন হইবেন? অথচ প্রলোভন তাঁহাকে ক্রমশঃই নানাবিধ সুখস্বপ্ন দেখাইয়া জাগতিক প্রেমোন্মত্ত করিতে লাগিল। বহু প্রয়াস সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথ স্বীয় হৃদয়কে

কুন্দনন্দিনীর চিন্তা হইতে বিরত করিতে না পারিয়া মদ্যপান দ্বারা তাহাকে বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিলেন। যে পাপে একবার লিপ্ত হইলে আর আত্ম-রক্ষা করা যায় না, সেই মহাপাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য তিনি মদ্যপান আরম্ভ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় মদ্যপান করায় কি দোষ, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই অলজ্জিতভাবে সূর্য্যমুখীকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দোষ ?"

চতুরা, বশীকরণাভিজ্ঞা, কর্তৃত্বশালিনী স্ত্রীর ন্যায় সূর্য্যমুখী যদি মদ্যপানের কুফল-সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া স্বামীর এরূপ আকস্মিক চিত্ত-পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে নগেন্দ্রনাথের অন্তর্নিহিত অগ্নি বাহিরে ইতস্ততঃ শিখা বিস্তার করিয়া কিয়ৎপরিমাণে হ্রস্বতেজ হইতে পারিত। কিন্তু স্বামীগতপ্রাণা, বিনয়াবনতা সূর্য্যমুখী স্বামীর ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া কিংবা মদ্যপানের ফলাফল সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া সরলভাবে উত্তর করিলেন, "দোষ কি, তাহা ত আমি জানি না। তুমি যাহা জান না, তাহা আমিও জানি না। কেবল আমার অনুরোধ।"

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম না হইলে যেরূপ গিরিপার্শ্বস্থিত স্থানসমূহ কম্পিত ও আলোড়িত হয়, সেইরূপ নগেন্দ্রনাথের মনোভাব বহিস্ফুরণের সুযোগ না পাইয়া তাঁহাকে সংক্ষুব্ধ করিল। তিনি ঈষৎ বিচলিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন—"সূর্য্যমুখি, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও, নচেৎ আবশ্যক করে না।

নগেন্দ্রনাথ প্রকৃতই তখনও সূর্য্যমুখীর অশ্রদ্ধার পাত্র হন নাই। কিন্তু তাঁহার মহৎ স্বামীর মুখে এরূপ কঠোর কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখী অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। ঘরের বাহিরে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়া স্বীয় হৃদয়-ভার কিঞ্চিৎ লঘু করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্ত্রীর অশ্রদ্ধা পুরুষের অবনতির কারণ

সংসার সুখের স্থান। সকলেই স্ব স্ব সুখবর্দ্ধনের জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু যখনই কাহারও আশা ভঙ্গ হয় বা হৃদয়ের শান্তি বিনষ্ট হয়, তখনই সে সুখসম্বর্দ্ধনের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। তখন কাহারও সাহচর্য্য সে পছন্দ করে না। আপন অতৃপ্ত অন্তঃকরণের আলোচনা লইয়াই সে তখন নিয়ত নিযুক্ত থাকে।

নগেন্দ্রনাথের তাহাই হইল। প্রেমপ্রভাব ও সম্ভোগ-প্রবৃত্তি তাঁহার শান্ত-হৃদয়ে অশান্তির সৃষ্টি করিল। তখন সেই অতৃপ্ত অন্তঃকরণ লইয়া নগেন্দ্রনাথ সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। জমিদারীর তত্ত্বাবধান ত্যাগ করিলেন; বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপ ত্যাগ করিলেন; এমন কি, তাঁহার প্রিয় বন্ধু হরদেব ঘোষালের সহিত সংশ্রব প্রায় ত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে চিঠি দেওয়া প্রায় বন্ধ করিলেন। যদি কখনও বা চিঠি দিতেন, তাহাতে কিছুই লিখিতেন না। শারীরিক কেমন থাকিতেন, তাহাও লিখিতেন না। কারণ, তখন তাঁহার শরীরের সুস্থতা বিশেষ সুখকর বোধ হইত না; জীবনধারণ বিড়ম্বনা হইয়া উঠিয়াছিল। তখন মৃত্যুই বরং তাঁহার বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল।

সূর্য্যমুখী তাঁহার অক্লান্ত সেবা ও অনাবিল প্রণয়ের প্রতিদানস্বরূপ এইরূপ ব্যবহার স্বামীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এতদিন তিনি তাঁহার সুখদুঃখের কথা কেবল স্বামীকে বলিয়াই শান্তি অনুভব করিতেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের রোষযুক্ত ব্যবহারের পর হইতে তাঁহাদের চিরানুভূত সখ্যভাব বিনষ্ট হইল। সেইজন্য হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন

করিয়া অন্তরের ভার লঘু করিবার উদ্দেশ্যে তিনি অভিমানভরে কমলমণিকে আসিতে লিখিলেন। সূর্য্যমুখী লিখিলেন—"একবার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃদ্ কেহ নাই। একবার এসো!"

সূর্য্যমুখী কমলকে আসিতে লিখিলেন, কিন্তু স্বামীকে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেন না। যে সূর্য্যমুখী পূর্ব্বে স্বামীর অনুমতি না লইয়া কোন কার্য্য করিতেন না, বা কোন কর্ম্ম সম্পাদিত হইলে স্বামীকে না জানাইয়া স্থির হইতে পারিতেন না, সেই সাধ্বী স্ত্রীর এখন আর পূর্ব্বের মত আচরণ করিতে সাহস হইত না; এবং সময়ে সময়ে প্রবৃত্তিও হইত না। এরূপ অভিমানের ফল যে কিরূপ বিষময় তাহা সূর্য্যমুখী জানিতেন না; জানিলে সেই পতিব্রতা স্ত্রী কখনই স্বামীর প্রতি অভিমান করিতেন না। যতদিন স্বামী স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত থাকে, ততদিন স্ত্রীর অভিমান তত ক্ষতিকর হয় না। কিন্তু স্বামী যখন স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত না থাকে, স্বামী যখন স্ত্রীর প্রেমপাশ ছিন্ন করিতে প্রয়াস করে, স্বামী যখন প্রণয়িনীর স্নেহ উপেক্ষা করিয়া কঠোরতা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করে, তখন স্ত্রীর অভিমান বিশেষ অনিষ্টকর। স্বামীর চিত্ত-পরিবর্ত্তনের সময় স্ত্রী যদি অভিমানভরে স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহা হইলে এই নির্লিপ্ততার সুযোগে স্বামী নির্ভয়ে স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারে। সুতরাং উন্মার্গগামী স্বামীর প্রতি একবার অভিমান করিলে আর সে স্বামীকে স্ত্রী নিজের করিয়া রাখিতে পারে না।

সূর্য্যমুখীর তাহাই হইল। যতদিন সূর্য্যমুখী স্বামীর প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া তাহার সহিত সস্নেহ ব্যবহার করিতেন, ততদিন নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীগত-চিত্ত হইয়াও একেবারে কুন্দময় হইতে পারেন নাই। স্ত্রীর নিকট কপটাচারী হইবার ভয়ে তিনি তখনও কুন্দনন্দিনীর চিন্তায় একেবারে মুগ্ধ হইতে পারেন নাই। পতিব্রতা স্ত্রীর প্রণয়, সেবা ও আত্মদানের কথা একেবারে

বিস্মৃত হইতে পারেন নাই বলিয়া তিনি তখনও কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে সূর্য্যমুখীর আসনে বসাইবার কথা ভাবিতে পারেন নাই। অধিকন্তু তাঁহার অন্তরে যাহাই থাকুক না কেন, নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর ভয়ে কুন্দের নিকট নিজে বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু যে দিন হইতে সূর্য্যমুখী অভিমানভরে স্বামীর নয়নান্তরালে দাঁড়াইলেন, সেইদিন হইতেই নগেন্দ্রনাথ অধঃপতিত হইলেন। তাঁহার শিক্ষা; তাঁহার চরিত্র, তাঁহার কৃতজ্ঞতা—সকলই উন্মাদনাতলে অন্তর্হিত হইল। কুন্দ-নন্দিনী নয়নপথে পতিত হইলে এতদিন যে নগেন্দ্রনাথ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেন, আজ সেই পুরুষ নির্জ্জনে কুন্দকে পাইয়া চরিত্রহীনের মত তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

পুরুষ-প্রকৃতির ইহা এক বিচিত্র গতি। পুরুষ যখন স্ত্রীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে ভালবাসে, তখন তাহাতেই অনুরক্ত হইয়া স্বীয় মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রয়াস পায়। স্ত্রীকেই একমাত্র অবলম্বন করিয়া পুরুষ সংসার করে, কিন্তু তাহাতে একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়া, স্ত্রীকে আরাধ্য মনে করিয়া তন্ময় হয় না। প্রকৃতিগত দৃঢ়তার সহিত পুরুষ সাংসারিক সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করে এবং অবসরমত পরস্পরের তৃপ্তি ও সন্তোষের জন্য চেষ্টা করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কোন পুরুষ স্ত্রীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট না হয়, কিংবা যদি স্ত্রীর ব্যবহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ মনে না করে, তাহা হইলেও সে স্বীয় প্রবৃত্তি দমন করিয়া সেই স্ত্রীতেই অনুরক্ত থাকিবার চেষ্টা করে। সংসারের কঠোর কর্ম্মে ও নানা দুশ্চিন্তায় পরিবৃত থাকিয়া পুরুষ অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে যদি সেই নির্ম্মল বিশ্রাম-সুখ হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে সে সততই একটা অভাব অনুভব করে; কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া সাধারণতঃ দমন করিতে প্রয়াস পায়। যখন চিত্তের এরূপ অবস্থা, তখন স্বামী যদি স্ত্রীর অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য প্রাপ্ত হয়,

তাহা হইলে ক্ষুব্ধ হইয়া সংসারকে অসার জ্ঞান করে, জীবনধারণ বিড়ম্বনা বলিয়া মনে করে। তখন পুরুষ যদি স্বীয় চিত্তকে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। সে বৈরাগ্যের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হয় না; তাহাতে কেবল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। এরূপ বৈরাগ্য জন্মিলে পুরুষ সংসারমধ্যে থাকিয়া, এমন কি, স্ত্রীর সম্মুখে থাকিয়াও, সকল বন্ধন মুক্ত করিবার বাসনা করে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় যদি স্বীয় চিত্তকে বশীভূত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া পরিতৃপ্ত হইবার চেষ্টা করে। তখন পুরুষ প্রলোভনে পতিত হইয়া অধঃপতিত হয়। যতদিন না তাহাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়, ততদিন সে কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য বিচারশূন্য হইয়া বিলাসে উন্মত্ত থাকে। কিন্তু আবার এমন দিন আসে, যখন তাহার লুপ্তজ্ঞান প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং স্বকৃত গৰ্হিত কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হয়।

প্রথমে নগেন্দ্রনাথের চিত্ত-পরিবর্ত্তন হইল। পরে বাসনা চরিতার্থ করিবার আশায় কুন্দনন্দিনীর প্রতি অনুরক্ত হইলেন। তৎপশ্চাৎ অভি-মানিনী সূৰ্য্যমুখী অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলে, তিনি নিন্দাভয় উপেক্ষা করিয়া কুন্দকে স্বীয় হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বয়ং প্রস্তাব করিলেন।

একদা সন্ধ্যাকালে নগেন্দ্রনাথের ভবন-সংলগ্ন পুষ্করিণীর সোপানের উপর বসিয়া কুন্দনন্দিনী স্বীয় জীবনের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিতেছিল। একদিকে নগেন্দ্রনাথের প্রতি তাহার অসীম ভালবাসা, অপর দিকে তৎচিন্তা-বিমূঢ় নগেন্দ্রনাথের মোহ ও অবনতি দর্শনে প্রতিপালিকা সূর্যমুখীর মরণান্তক ক্লেশ—এই দুই এর দ্বন্দ্বে ব্যথিতা হইয়া কুন্দনন্দিনী প্রাণের জ্বালা শীতল বাপী-জলতলে নির্ব্বাপিত করিবার জন্য ধীরে ধীরে সোপানা-বতরণ করিতেছিলেন, এমন সময় নগেন্দ্রনাথ তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া ডাকিলেন, "কুন্দ!"

নিভৃতস্থানে পরস্ত্রীর সহিত আলাপ অভদ্রোচিত কার্য্য জানিয়া, বিধবা কুন্দের পবিত্রতা ও মর্য্যাদার প্রতি চিন্তাশূন্য হইয়া, নগেন্দ্রনাথ তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া অতি ঘৃণিত এক প্রস্তাব করিলেন। এ প্রস্তাব যাহাতে কুন্দের নিকট ঘৃণিত বলিয়া বোধ না হয়, সেইজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া নগেন্দ্র বলিলেন—"শুন, কুন্দ! এখন বিধবা-বিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"

নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর বৈধব্যে এবং তাহার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশে দুঃখিত হইয়া প্রথমে তাহাকে সহানুভূতির চক্ষে দেখিলেন। কুন্দকে দেখিতে ও তাহার কথা মনোমধ্যে আলোচনা করিতে তাঁহার ভাল লাগিল। তখন নগেন্দ্রনাথের অজ্ঞাতসারে কুন্দনন্দিনীর প্রতি রূপজ মোহ তাঁহার চিত্ত অধিকার করিল। তখন তিনি কামুক পুরুষের মত মোহমুগ্ধ না হইয়া, প্রলুব্ধের মত অনুরক্ত না হইয়া, চিত্ত সংযত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন দেখিলেন যে যৌবনের অতৃপ্ত বাসনা তাঁহাকে বশীভূত করিয়া কুন্দনন্দিনীতে মুগ্ধ করিয়াছে, তখন সেই তরুণীকে ভুলিবার জন্য তিনি মদ্যপান আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মদ্যের মত্ততাও যখন চিত্ত হইতে কুন্দের চিন্তা দূরীভূত করিতে পারিল না, তখন নগেন্দ্রনাথ ইতর হইয়াও ইতরভাবে কুন্দকে লাভ করিতে চাহিলেন না।

যখন প্রলোভনের সহিত আত্মদমনের এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তখন বিধবা-বিবাহ-প্রবর্ত্তনরূপ সামাজিক আন্দোলন প্রলোভনের সহায়তা করিল। তখন বিজিত নগেন্দ্রনাথ সমাজচলিত শাস্ত্রানুমোদিত বিধি-অনুসারে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিবার আশা করিলেন। সূর্য্যমুখীর অভিমান এই আশার সহায়তা করিল। তখন নগেন্দ্রনাথ কালক্ষেপে অসহিষ্ণু হইয়া নিভৃতে কুন্দকে পাইয়া তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

যে নগেন্দ্রনাথ চরিত্রবলে এতদিন দেশপূজ্য হইয়াছিলেন, যে পুরুষের সাধু-চরিত্রের উপর বিশ্বাস করিয়া দরিদ্র ভদ্রকন্যারা তাঁহার সংসারে দাসি-বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকিতে কুণ্ঠিত হইত না, যাঁহার বহুবর্ষব্যাপী ব্যবহার দর্শন করিয়া কুন্দনন্দিনী মাতৃমূর্ত্তি কর্তৃক সতর্কিতা হইয়াও কোন সন্দেহ পোষণ করিতে পারে নাই—আজ সেই নগেন্দ্র অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করিবার আশায় উন্মত্ত হইয়া বাপী-তীরস্থিতা কুন্দকে একাকী পাইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে করার্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। বাঞ্ছিত লাভের আশায় অধীর হইয়া তিনি কুন্দকে বলিলেন—"তুমি বলিলেই বিবাহ করি। বল, বল—বল, আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভালবাসিবে কি না?"

কুন্দনন্দিনী এ প্রস্তাবে সম্মতা হইল না। তখন নগেন্দ্রনাথ স্বীয় অনুরাগের পরিচয় দিয়া প্রেমময় হৃদয়খানি কুন্দের সম্মুখে ধরিলেন, কিন্তু কুন্দ তাহাতেও উপেক্ষা প্রদর্শন করিল। তখন নগেন্দ্রনাথ আশাহত হইয়া শূন্যমনে শূন্যপ্রাণে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনের চিন্তা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সৌন্দর্য্যোপলব্ধি ও ভোগপ্রবৃত্তি

আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই যে সমাজের উচ্চ-শ্রেণীর লোকের মধ্যেও অনেকের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার শক্তি থাকে না। সুন্দর বস্তু অনেকেই দেখিয়া থাকে, কিন্তু কয়জন তাহা দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতে পারে? সৌন্দর্য্য দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে হৃদয়ের যে

পরিমাণ উদারতা, ধৈর্য্য ও স্বার্থশূন্যতা আবশ্যক হয়, তাহা অতি অল্প লোকেই পাইয়া থাকে। শিক্ষাদ্বারা এ ক্ষমতার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের প্রতি যাহার চিত্ত আকৃষ্ট না হয় এবং ইহাতে যাহার আসক্তি না থাকে, শিক্ষা তাহার পক্ষে বিশেষ উপকার করিতে পারে না।

নগেন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিলেন। প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে নগেন্দ্রনাথ জানিতেন। সুরুচিসম্পন্ন বলিয়া তিনি পৈতৃক বসতবাটির নির্ম্মাণপ্রণালীতে সন্তুষ্ট না হইয়া স্বীয় অভিলাষানুরূপ সুন্দর বাসভবন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং পুষ্পোদ্যানে মর্ম্মরমণ্ডিত লতাচ্ছাদিত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ নিজে সুন্দর পুরুষ ছিলেন এবং সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারিতেন। কেহ কেহ এরূপ বিচক্ষণ যে, সুন্দর পুরুষ বা স্ত্রী দেখিলে তাহার বিশেষ বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এরূপ সূক্ষ্ম বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয় যে, সে রূপের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে না। সুন্দরীর কমনীয়তা, রূপের লালিত্য, চক্ষের চাঞ্চল্য, চরণের ধীর স্থির ভঙ্গিমা এবং বদনমণ্ডলের প্রশান্তভাব—যাহাতে হৃদয়ের সরলতা ও পবিত্রতা সদা প্রকটিত হয়, এ সকল মাধুরী গ্রহণ করিবার শক্তি তাহাদের থাকে না। তাহারা রূপের তীব্র সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হয়, শোভা সন্দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে চাহে না।

নগেন্দ্রনাথ এ শ্রেণীর সমালোচক ছিলেন না। সেইজন্যই কুন্দনন্দিনীর রূপ, অনেকের তুলনায় তাহা অপ্রশংসনীয় হইলেও, তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। রূপমাধুর্য্য উপভোগ করিবার শক্তি ছিল বলিয়াই নগেন্দ্রনাথ অপ্রাপ্ত-যৌবনা বালিকা কুন্দনন্দিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ের অনুরূপ কুন্দের নির্ম্মল মনোভাব ও সরলস্নিগ্ধ কটাক্ষ দেখিয়া তিনি আত্মহারা হইতেন। হৃদয়ের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বালিকার রূপ

দর্শন করিতে পারা যায় বলিয়া তিনি প্রাণ ভরিয়া সে শোভা দেখিতেন এবং অন্তরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ করিতেন। সে সুখের ও আনন্দের পরিচয় আমরা তাঁহার পত্র হইতে পাইয়া থাকি। তিনি লিখিয়াছিলেন—"চক্ষু দুইটি যে কিরূপ, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার এক রকম দেখিলাম না; আমার বোধ হয়, যেন এ পৃথিবীর সে চোক নয়; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখে না; অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে। কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী, তাহা নহে। অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্তমাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।"

নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার পরিচিত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া মনে করিলেন।

বিবাহিত পুরুষদিগের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যাহারা আপন আপন স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছে এবং তাহাতেই যাহাদের রূপতৃষ্ণা মিটিয়াছে, তাহারা স্ত্রীকেই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া মনে করে। তাহারা অন্য স্ত্রীর রূপ দেখিতে চাহে না এবং কোন সুন্দরী স্ত্রী নয়নপথে পতিত হইলে, আপন স্ত্রীর রূপ চিন্তা করিয়া অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইয়া লয়। যাহার রূপতৃষ্ণা মিটে নাই, সেই কেবল অন্য স্ত্রীর রূপ-দর্শনের অভিলাষ রাখে এবং রূপসী দেখিলেই অতৃপ্ত-নয়নে সেইদিকে চাহিয়া থাকে।

নগেন্দ্রের রূপতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয় নাই। সূর্য্যমুখী ইহা জানিতেন। তিনি আরও জানিতেন যে, নগেন্দ্রের অতৃপ্তলালসা এরূপ প্রবল এবং হৃদয় এত দুর্ব্বল যে, সহজেই তিনি স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হইতে পারেন; এমন কি, প্রকৃত রূপসী পাইলে বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাকে

ভুলিয়া বিবাহ করিতেও পারেন। এই আশঙ্কা সূর্য্যমুখীর অন্তরে ছিল বলিয়াই নগেন্দ্রের কলিকাতায় অবস্থানকালে লিখিয়াছিলেন, "যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি বরণডালা সাজাইতে বসি।"

উপহাস করিয়া সূর্য্যমুখী স্বামীকে এ কথা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত আশঙ্কা না থাকিলে স্ত্রীলোক কখনও স্বামীকে এরূপ উপহাস করিতে পারে না। পতিপ্রাণা স্ত্রী এইরূপ উপহাস দ্বারা সময়ে সময়ে স্বামীর চিত্ত দুষ্প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। নগেন্দ্র আপন গৃহের কর্ত্তা, সুতরাং স্বাধীন, দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্ এবং সমাজপতি। যদি তিনি নীতি-বিরুদ্ধভাবে কুন্দকে গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেন, তাহা হইলে প্রতিবাদ করিয়া কেহই তাঁহাকে এ প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারিত না। নগেন্দ্র ইহা বুঝিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রবৃত্তি এরূপ হীন অসংযত ছিল না বলিয়াই তিনি কুন্দের প্রতি অনুরাগ প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

কুন্দের প্রতি মোহাচ্ছন্ন হইয়াও বৈধ-উপায়ে তাহাকে লাভ করিতে না পারায়, যখন নগেন্দ্রনাথ অশান্ত-হৃদয়ে দিনযাপন করিতেছিলেন, তখন মহাত্মা বিদ্যাসাগর বালবিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণিত করিয়া সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছিলেন। বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক পুস্তিকা পাঠ ও আলোচনা করিয়া নগেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে, তিনি কুন্দকে ধর্ম্ম-বিবাহ করিবেন। তাঁহার ইচ্ছার অনুকূলে আন্দোলন শুনিয়াই যে তিনি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা নহে। পতিপরায়ণা স্ত্রী জীবিত থাকিতে পুনরায় বিবাহ করা উচিত কি না, সে সম্বন্ধে আলোচনা

করিয়া যখন তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার পক্ষে এরূপ বিবাহ মঙ্গলজনক, তখনই তিনি বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ বিচার করিয়া দেখিলেন যে, পুরুষের দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ নহে। বিশেষতঃ তিনি নিঃসন্তান ছিলেন; সুতরাং বংশরক্ষার জন্য সন্তানের আশায় দ্বিতীয়বার বিবাহ তাঁহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। দুই বিবাহ করিলে তাঁহার শান্তির সংসারে অশান্তি আসিতে পারে ভাবিয়া, তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু যখন সূর্য্যমুখী আপনি হইতে এ বিবাহের প্রস্তাব করিয়া কুন্দকে বিবাহ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, তখন নগেন্দ্রের কর্ত্তব্য স্থির হইল। তিনি কুন্দকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন।

এ বিবাহ যে সূর্য্যমুখী অন্তরের সহিত অনুমোদন করিতেছেন এবং ইহা যে তাঁহারও অভিপ্রেত—মোহমুগ্ধ নগেন্দ্রনাথ ইহা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়াছিলেন। সেইজন্য যখন শ্রীশচন্দ্র স্নেহময়ী পত্নীর মনোকষ্টের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে এ বিবাহ হইতে বিরত হইবার জন্য লিখিয়াছিলেন, তখন নগেন্দ্র পত্রোত্তরে লিখিলেন, "সূর্য্যমুখী এ বিবাহে দুঃখিতা নহেন। তিনিই বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে উদ্যোগী। তবে আর কাহার আপত্তি? তবে কোন্ কারণে আমার এই বিবাহ নিন্দনীয়?"

মোহান্ধ নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর রূপে বিমোহিত হইয়া অতৃপ্ত বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য সেই বিধবাকে বিবাহ করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অবিশ্বাস বিচ্ছেদের মূল

নগেন্দ্রনাথের বিপুল ভবন, বিরাট সংসার। তাহাতে পরিবার-পরিজন অনেক। সেখানে কত অতিথি-ফকির আসে, খায়, চলিয়া যায়, কিন্তু প্রায় কেহই অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করে না। একদিন এক বৈষ্ণবী অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুরবাসিনীদিগের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাঁহারা গান শুনিতে ইচ্ছা করেন কি না জানিয়া তাঁহাদের একজনের অভিলাষমত একটি কীর্ত্তন গান করিল। সঙ্গীত-মাধুর্য্যে সকলকে মুগ্ধ করিয়া বৈষ্ণবী যখন পুরস্কার চাহিল, তখন সূর্য্যমুখী তথায় উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যমুখীকে গান শুনাইবার জন্য একজন পুরবাসিনী অনুজ্ঞা করিলে, বৈষ্ণবী অনন্য-সাধারণ-কণ্ঠে এক শ্যামাবিষয় গান করিল। গান শুনিয়া সূর্য্যমুখী মোহিতা হইলেন, এবং পুরস্কার দিয়া বৈষ্ণবীকে বিদায় করিলেন। বৈষ্ণবীর শারীরিক গঠন ও কণ্ঠস্বর হইতে পুরবাসিনীদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও সন্দেহ হইয়াছিল যে, বৈষ্ণবী প্রকৃত স্ত্রীলোক কি না? কিন্তু সূক্ষ্মভাবে সে বিষয়ে আলোচনা না করায়, এ সন্দেহ কাহারও হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় নাই।

কিছুদিন পরে বৈষ্ণবী পুনরায় পুরবাসিনীদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এইদিন সূর্য্যমুখী তথায় উপস্থিত ছিলেন। বৈষ্ণবী গান আরম্ভ করিলে সূর্য্যমুখী তাহার ননদিনী কমলমণিকে গান শুনিবার জন্য ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কুন্দ কমলের নিকট ছিল। কমল কুন্দকে লইয়া গান শুনিবার জন্য যথায় সূর্য্যমুখী ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন।

তখন বৈষ্ণবী গান করিতেছিল—

"মরি মর্‌ব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে
নবীন মুকুল।"

এ গান কমলমণি ও সূর্য্যমুখীর পছন্দ না হওয়ায়, সুরুচিসম্পন্ন গান করিতে বলিলে বৈষ্ণবী গাহিল—

"স্মৃতি-শাস্ত্র পড়্‌ব আমি ভট্টাচার্য্যের পায়ে ধ'রে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম শিখে নিব, কোন্ বেটী বা নিন্দে করে॥"

গান শুনিয়া কমলমণি ও সূর্য্যমুখী অসন্তোষের সহিত উঠিয়া গেলেন। তাঁহাদের দেখিয়া পুরবাসিনীদিগের মধ্যে অনেকেই উঠিয়া গেলেন। কুন্দনন্দিনী বিষণ্ণ-অন্তঃকরণে কমলের সহিত তথায় আসিয়াছিল। সে আর উঠিল না। তাহার চিত্ত তখন সঙ্গীত বা পুরবাসিনীদিগের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। সে দুঃখভারাক্রান্তচিত্তে বিমূঢ় হইয়া তথায় বসিয়া রহিল।

আর গান হইল না দেখিয়া অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ উঠিয়া গেলেন। তখন বৈষ্ণবী কুন্দকে একাকিনী পাইয়া তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিল। যখন বৈষ্ণবী মনঃসংযোগের সহিত কথা কহিতেছিল এবং কুন্দ নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়াছিল, তখন সূর্য্যমুখী তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া কমলকে দেখাইলেন এবং বৈষ্ণবীকে কোন ছদ্মবেশী পুরুষ মনে করিয়া তাহার অনুসন্ধানে চতুরা দাসী হীরাকে নিযুক্ত করিলেন। তাহার আবাস স্থির করিবার উদ্দেশ্যে হীরা গৃহগমনোন্মুখী বৈষ্ণবীর অনুসরণ করিল।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে হীরা বৈষ্ণবীর প্রকৃত পরিচয় পাইল; এবং কি উদ্দেশ্যে সেই ছদ্মবেশী পুরুষ নগেন্দ্রের অন্তঃপুরমধ্যে যাতায়াত করে তাহাও জানিল। পরদিন প্রাতে সকল সংবাদ যথাযথ না বলিয়া—কুন্দের চরিত্র

যে নিষ্কলঙ্ক তাহা না বলিয়া—দুষ্টা হীরা প্রভুপত্নীর নিকট বৈষ্ণবী-সম্বন্ধীয় সকল ঘটনা যে ভাবে বিবৃত করিল, তাহাতে কুন্দের চরিত্রসম্বন্ধে সূর্য্যমুখীর সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। তিনি কুন্দনন্দিনীকে সহসা ঘোর পাপিষ্ঠা স্থির করিলেন।

অনেকদিন হইতেই সূর্য্যমুখী স্বামীর চিত্তপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহার দেবোপম স্বামীর চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। যে স্বামীর চরিত্র এতদিন নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র ছিল, এখন তাহা আপনা হইতে কখনও ভ্রষ্ট হইতে পারে না। সূর্য্যমুখী মনে করিতেন, কোন স্ত্রীলোকের প্রলোভনে ও প্ররোচনায় তাঁহার স্বামীর চরিত্রদোষ জন্মিতেছে। কুন্দনন্দিনীর সহিত ছদ্মবেশী পুরুষের আলাপ দর্শন করায় ও হীরার অনুসন্ধানের ফলে সূর্য্যমুখী কুন্দনন্দিনীকেই ইহার মূল কারণ স্থির করিলেন। কুন্দনন্দিনীর জন্যই তিনি তাঁহার স্ত্রীগতপ্রাণ স্বামীর অঙ্ক হইতে বিচ্যুত হইতেছেন মনে করিয়া ঈর্ষাবশতঃ ও বিধবা রমণীর অসংযত চিত্ত দর্শন করিয়া কোপ-প্রযুক্ত কুন্দকে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে আদেশ করিলেন।

হীরার কথায় সূর্য্যমুখী কুন্দকে অসচ্চরিত্রা স্থির করিয়া তাঁহার আলয় ত্যাগ করিয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। কুন্দ সেই রাত্রেই মনের দুঃখে সে ভবন ত্যাগ করিয়া গেল, কিন্তু সূর্য্যমুখী এ সম্বন্ধে কোন কথা স্বামীকে বলিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন—কুন্দ বিদায় হইয়াছে, সুতরাং স্বামীর আর চিত্ত-বিকার জন্মিবে না; তাঁহার স্বামী অচিরে তাঁহারই হইবেন, এবং ভবিষ্যতে আবার তাঁহার হইয়াই থাকিবেন। সরলা সূর্য্যমুখী নিজের সুখদুঃখ গণনা করিয়াই সমস্ত বিচার করিলেন, স্বামীর অন্তরের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন না। অসীম স্বার্থভাব হৃদয়-নিহিত থাকায় সূর্য্যমুখীর বিচারশক্তি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং কুন্দনন্দিনীর অন্তর্ধান স্বামীর হৃদয়ে যে কিরূপ শেল বর্ষণ করিবে, তাহা

তিনি একবারও ভাবিলেন না। যে স্বামী কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সাদরে প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যমুখীকে হৃদয়াসন হইতে অপসারিত করিতে-ছিলেন, সেই প্রণয়পাত্রীর স্থানান্তর-গমন তিনি সহ্য করিতে পারিবেন কি না তাহাও সূর্য্যমুখী একবার চিন্তা করিলেন না। অথচ এ সংবাদ শ্রবণ করিলে স্বামী রুষ্ট হইবেন, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। সেইজন্য স্ত্রীজন-সুলভ প্রবৃত্তিবশতঃ সূর্য্যমুখী কুন্দনন্দিনী-সম্বন্ধীয় সকল কথা গোপন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্ত্রীর অবিশ্বাসে পুরুষের রোষোৎপত্তি

সূর্য্যমুখীর সংসার ত্যাগ করিয়া যাওয়ার কিছুদিন পূর্ব্বে নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে একাকী পাইয়া নবপ্রচলিত বিধানানুসারে তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা জানাইয়া তাহার মত চাহিয়াছিলেন। আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য দুর্ব্বৃত্তের মত কুন্দনন্দিনীকে লাভ করিবার চিন্তামাত্রও না করিয়া তিনি যুক্তি-প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্ম-বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বলিলেন—"এখন বিধবা-বিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।" কুন্দনন্দিনী অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কেবলমাত্র বলিল—"না।"

কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের এই প্রস্তাবের উত্তর এত সহজে, এত ছোট কথায় বলিল যে, নগেন্দ্র তাহার চিত্তসম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারিলেন না। পরে যখন তিনি শুনিলেন যে, কুন্দ অকস্মাৎ তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন তিনি স্থির করিলেন, তাঁহারই ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া

এবং ধর্ম্মহানির আশঙ্কা করিয়া কুন্দ স্থানান্তরে গিয়াছে। এ সংবাদে নগেন্দ্রনাথ মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু লজ্জায় কুন্দ-সম্বন্ধে কোন কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। কুন্দনন্দিনীর অদর্শনে তিনি অন্তরে অসীম ক্লেশানুভব করিলেন, অথচ দুঃখের শমতার জন্য তিনি তাঁহার পাপ অন্তঃকরণ লইয়া স্ত্রীর নিকটও আসিতে সাহস করিলেন না।

স্বকৃত-দোষের প্রতিফল-স্বরূপ এই হৃদয়-বিদারক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে বলিয়া নগেন্দ্রনাথ আত্মদমন করিতে চেষ্টা করিলেন। কুন্দের চিন্তা ত্যাগ করিয়া তিনি চিত্ত বশীভূত করিবার প্রয়াস করিলেন। কিন্তু দেখিলেন যে, ক্ষুদ্র কুন্দনন্দিনী তাঁহার বিরাট হৃদয়ে সম্যক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার একাগ্র হৃদয় কুন্দের আরাধনায় এরূপ নিবিষ্ট হইয়াছিল যে, সেই হৃদয়াসীনাই তখন তাঁহার একমাত্র সুখ, একমাত্র শান্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইল। যখন কুন্দনন্দিনী-শূন্য সংসার তাঁহার নিকট মরুভূমি-সদৃশ বোধ হইতেছিল, তখন একদিন দুষ্টা হীরা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রভু এবং প্রভুপত্নীর মধ্যে বিরোধ বাধাইবার জন্য সূর্য্যমুখীর বিরুদ্ধে নগেন্দ্রনাথের নিকট অভিযোগ করিল। সে বলিল—"মা-ঠাকুরাণীর মুখ বড় এলোমেলো হয়েছে—কারে কখন্ কি বলেন, ঠিক নাই। সেদিন কুন্দঠাকুরাণীকে কি না বলিয়াছিলেন। শুনিয়া কুন্দঠাকুরাণী দেশত্যাগী হ'য়েছেন। আমাদের ভয়, পাছে আমাদের সেইরূপ কোন্ দিন কি বলেন, আমরা তা-হ'লে বাঁচিব না। তাই আগে হ'তে সরিতেছি।"

নগেন্দ্রনাথ হীরার কথা শুনিয়া যখন বুঝিলেন যে তাঁহার ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া কুন্দ গৃহত্যাগ করে নাই, তখন তাঁহার চিত্তে এক নূতন ভাব জাগ্রত হইল। কুন্দের প্রতি প্রণয় ও আবেগ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। কুন্দকে পাইবার যে আশা এতদিন নগেন্দ্রনাথের চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল আজ আবার তাহা উদিত হইয়া তাঁহার হৃদয়াকাশে তীব্র

আলোক-ছটা বিকীর্ণ করিল। সেই উজ্জ্বল রশ্মিতলে তাহার হৃদয়-নিহিত সকল সাধুবৃত্তি, প্রগাঢ় পত্নীপ্রেম, পিতৃভবন—সকলই ম্লান হইয়া গেল। তখন কুন্দনন্দিনীকে পাইবার আশা ও তজ্জনিত ভোগতৃষ্ণা সমষ্টিভূত হইয়া এরূপ ভীষণ রাক্ষসীর আকার ধারণ করিল যে, তাহারই বিস্তৃত বদনতলে নগেন্দ্রের কার্য্যাকার্য্য বিচার-শক্তি সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হইল। তখন নগেন্দ্র আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়া, অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যমুখীকে সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছিলে?"

বৈষ্ণবীর গমনাগমন, কুন্দের সহিত আলাপ, হীরার অনুসন্ধান, কুন্দনন্দিনীর তিরস্কার ও গৃহত্যাগ প্রভৃতি সকল ঘটনা অকপটভাবে বর্ণনা করিয়া সূর্য্যমুখী বলিলেন, "আমি কুন্দকে তাড়াইয়া আপনার মরমে আপনি মরিয়া আছি। দেশে দেশে তাহার তত্ত্বে লোক পাঠাইয়াছি। যদি সন্ধান পাইতাম, ফিরাইয়া আনিতাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্রনাথ তখন দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তোমার বিশেষ অপরাধ নাই, তুমি যেরূপ কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন্ ভদ্রলোকের স্ত্রী তাকে মিষ্ট কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে? কিন্তু একবার ভাবিলে ভাল হইত যে, কথাটা সত্য কি না?"

সূর্য্যমুখী উত্তর করিলেন, "তখন সে কথা ভাবি নাই। এখন ভাবিতেছি।"

সূর্য্যমুখীর অনুশোচনা ও ক্লেশ দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ বিচলিত হইলেন না; পত্নীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া তিনি অতি অল্প কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাবিলে না কেন?"

"আমার মনের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল,"—বলিতে বলিতে সূর্য্যমুখী স্বামীর পদযুগল বাহুদ্বারা বেষ্টিত করিয়া অবিরত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

যে কঠোর চিন্তা এতদিন তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছিল, তাহা তিনি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। প্রতি অশ্রুবিন্দু সেই সাধ্বী পতিপ্রাণার হৃদয়খানি স্বামীর সমক্ষে প্রকাশ করিতেছিল। পতি-দেবতার চরিত্র-সম্বন্ধে সন্দেহযুক্তা হওয়ায়, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। সেই উদ্বেলিত হৃদয়ের আবেগ দর্শন করিয়া নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর হৃদয়-সম্বন্ধে সকলই অনুমান করিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমায় বলিতে হইবে না। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত।"

সূর্য্যমুখী কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। স্বামীর চরণোপরি মস্তক রাখিয়া তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। কিছু পরে মনের আবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, ক্লিষ্ট মুখখানি স্বামীর মুখপ্রতি রাখিয়া সূর্য্যমুখী বলিলেন—"কি বলিব তোমায়? আমি যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহা কি তোমায় বলিতে পারি? মরিলে পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে, এইজন্য মরি নাই। নহিলে যখন জানিয়াছিলাম, অন্যা তোমার হৃদয়-ভাগিনী, আমি তখন মরিতে চাহিয়াছিলাম। মুখের মরা নহে, আমি যথার্থ আন্তরিক অকপটে মরিতে চাহিয়াছিলাম, আমার অপরাধ লইও না।"

সূর্য্যমুখীর এই করুণ হৃদয়বিদারক কথা শুনিয়াও নগেন্দ্রনাথ বিচলিত হইলেন না। স্ত্রীর অকপট প্রেম, স্বামী-সেবা ও আত্মদান তাঁহার হৃদয়ে কোমলতা সম্পাদন করিতে পারিল না। তিনি তাঁহার স্থিরসিদ্ধান্ত হইতে ঈষৎ স্খলিত হইলেন না। যে মর্ম্মান্তিক বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা সহসা প্রকাশ করিতে না পারায়, তিনি অনেকক্ষণ স্থিরভাবে রহিলেন। পরে হৃদয় পাষাণ অপেক্ষা দৃঢ় করিয়া নগেন্দ্র বলিলেন—"সূর্য্যমুখী! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা।······আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর

সংসারে আর সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই—আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশদেশান্তরে ফিরিব। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিধবা।·· ···এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব! নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ!"

স্বামীর এই নিদারুণ বাক্যাবলী শুনিয়া সূর্য্যমুখী মর্ম্মাহতা হইলেন। দুঃখ যখন চরম-সীমায় উপনীত হয়, তখন আর অশ্রুক্ষরণ হয় না। সূর্য্যমুখী আর অশ্রু-বর্ষণ করিলেন না। বাতাহত কদলীর ন্যায় বিধ্বস্ত ও অবলুণ্ঠিত হইয়া, ক্লিষ্ট বদনমণ্ডল প্রচ্ছন্ন রাখিয়া স্বামী-পদতলে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন। মনে মনে বলিলেন, পাছে আমার কষ্ট হয়, সেইজন্য তুমি দেশত্যাগী হইয়া কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে চেষ্টা করিবে আর তোমা-শূন্য তোমার এই সংসারে আমি গৃহিণী হইয়া থাকিব? তোমার সুখ বড় না আমার যন্ত্রণা বড়? দেবতা আমার! আমিই তোমার সুখের পথ নিষ্কণ্টক করিব।

ক্ষণিক পরেই সূর্য্যমুখী উঠিয়া বসিলেন। স্বামীর চরণে হাত রাখিয়া বলিলেন—"এক ভিক্ষা।"

নগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন—"আর একমাস মাত্র গৃহে থাক। ইতিমধ্যে কুন্দনন্দিনীকে যদি না পাওয়া যায়, তবে তুমি দেশত্যাগ করিও। আমি মানা করিব না।"

নগেন্দ্রনাথ স্বীকৃত হইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

আসক্তি

আসক্তি জীবসাধারণের এক প্রধান বৃত্তি। ইহা প্রত্যেক মানব-চিত্তে সমভাবে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মানব-চরিত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ইহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পার্থক্যের প্রধান কারণ—সংযম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানব-শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আসক্তির উদ্রেক হয় এবং সেই আসক্তি সমভাবে সকল জীবকে আলোড়িত করে। যাহার আসক্তি চরিতার্থ করিবার অবসর এবং উপায় আছে, সে একটি আকাঙ্ক্ষা সম্যক্ পরিতৃপ্ত করিয়া অন্য আকাঙ্ক্ষার প্রতি ধাবিত হয়। এই শ্রেণীর লোক নীতি ও আচারের বশবর্ত্তী থাকিয়া বৈধ-উপায়ে আকাঙ্ক্ষা-সৃজন ও তাহার পরিতৃপ্তিকেই চরম সুখ বলিয়া মনে করে। যাহার আসক্তি পরিতৃপ্ত হইবার উপায় নাই, অথচ চিত্তকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা আছে, সে সংযমের দ্বারা আসক্তি দমন করিতে পারে; কিন্তু আসক্তি একেবারে বিনষ্ট করিতে পারে না। যখনই সে সেই আসক্তিমূলক কোন ঘটনা দেখিতে পায় বা তাহার সম্মুখে সেই আসক্তিপূরণ-সমর্থ কোন ব্যাপার ঘটে, তখনই সেই দমিত আকাঙ্ক্ষা চিত্তমধ্যে উদিত হয়। যতদিন সংযম অক্ষুণ্ণ থাকে, কিংবা প্রলোভনমধ্যে পতিত না হয়, ততদিন সে আসক্তি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। কিন্তু একবার প্রলোভনে পতিত হইলে বা প্রলোভনের দুর্দ্দমনীয় স্রোতোবেগ সংযম দ্বারা নিরোধ করিতে না পারিলে, সে আসক্তিমধ্যে নিমজ্জিত হয় এবং প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ-রূপে চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই শ্রেণীর লোকের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা চিরকাল আসক্তি-পূরণে উন্মত্ত থাকিতে পারে না। এমন কি,

তাহারা যখন আসক্তি-পূরণে রত থাকে, তখনও তাহাদের মধ্যে সংযমের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং তুচ্ছ দেহসুখে এই শ্রেণীর লোককে চিরমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না।

সংসারে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির উপায় নাই অথচ আত্মসংযমের প্রবৃত্তিও নাই। অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সে লজ্জা, শাসন, সমাজভয় প্রভৃতি সকল প্রকার বন্ধন উপেক্ষা করিয়া আত্ম-তৃপ্তির পথে ধাবিত হয় এবং যত ভোগ ঘটে, ততই তাহার আগ্রহ ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। এরূপ ঘৃণিত জীবন সমাজের নিম্নস্তরে অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সময়ে সময়ে উচ্চ-বংশেও এরূপ প্রবৃত্তি-সম্পন্ন লোক দৃষ্টিগোচর হয়।

ধনী-সন্তান নগেন্দ্রনাথ আসক্তি-পূরণে সমর্থ হইলেও আকাঙ্ক্ষার দাস ছিলেন না। সকল সময় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার জন্য তিনি আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করিয়া তাহা উপভোগ করিবার জন্য প্রয়াস করিতেন না, অথচ তাঁহার সাধারণ আসক্তিগুলি অপূর্ণ থাকিত না। মানবপ্রকৃতি-গত কতকগুলি আসক্তি চরিতার্থ না হওয়ায়, নগেন্দ্রনাথের কর্ম্মময় চিত্তে তাহা এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিল যে, তিনি তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও জানিতে পারিতেন না এবং সেইজন্য সে প্রবৃত্তিগুলি সংযত করিবার আবশ্য-কতা কখনও বোধ করেন নাই। যৌবনসুলভ আসক্তি যে কত প্রবল এবং তাহার প্রভাব যে কত ভীষণ, তাহা নগেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সেইজন্য যৌবনের অতৃপ্ত বাসনা যে কখনও তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিবে এ কথা সূর্য্যমুখীর অঙ্কস্থিত নগেন্দ্রনাথের মনে কদাচ উদিত হয় নাই।

আকাঙ্ক্ষা কখনও বিনষ্ট হয় না, কেবল প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে মাত্র। যখন প্রলোভন চিত্তাকর্ষণ করে, তখন আসক্তি প্রকাশ পায়। পূর্ণযৌবনা

কুন্দনন্দিনী যখন নগেন্দ্রের নয়ন-পথে পতিত হইল, কুন্দকে দেখিতে ও তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যখন নগেন্দ্র সুখবোধ করিলেন, তখন যুবতী স্ত্রীর সোহাগ ও আদর উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইল। তিনি সে প্রবৃত্তি দমন করিতে পারিলেন না। আত্মসংযমে অনভ্যস্ত নগেন্দ্রনাথ চিত্ত বশীভূত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি অকপট-চিত্তে কুন্দ-নন্দিনীতে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু কুন্দকে কামুকের মত গ্রহণ না করিয়া তিনি শাস্ত্রসঙ্গত উপায়ে বিবাহিত পত্নীরূপে পাইবার অভিলাষ করিলেন।

যখন কুন্দই তাঁহার সংসার-সুখের একমাত্র উপকরণ বলিয়া বোধ হইতেছিল, তখন সহসা সূর্য্যমুখী তাঁহার সুখের পথ রোধ করিলেন। সূর্য্যমুখী কুন্দকে বিতাড়িত করিয়াছেন শুনিয়া আত্মসংবরণে অসমর্থ নগেন্দ্র অধীর ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। তখন প্রাণপ্রিয়া সূর্য্যমুখীর মনোবেদনা ও মরণাধিক যন্ত্রণা, আত্মীয় পরিজনের ক্লেশ, সংসারের অবনতি প্রভৃতি কোন চিন্তা তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। তখন কঠোর-চিত্ত নগেন্দ্রনাথ পাষাণ-প্রতিকৃতির ন্যায় স্থির হইয়া সূর্য্যমুখীর মর্ম্মান্তিক যাতনা দর্শন করিলেন।

কুন্দনন্দিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নগেন্দ্রনাথ পতিপ্রাণা সূর্য্যমুখীর প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু তাঁহার এ মনোভাব চিরস্থায়ী হইল না। যে একবার সৎ ও সুজন হইয়াছে, যে একবার সৌজন্য ও মনুষ্যত্বের জন্য খ্যাতি পাইয়াছে, সে ক্ষণিক মানসিক অবসাদ ও দুর্ব্বলতার জন্য অন্যায় কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে চিরকাল লিপ্ত থাকিতে পারে না। মোহ অপগত হইলেই সে আবার পূর্ব্ববৎ আচরণ করিতে আরম্ভ করে। তখন মোহের বস্তু পার্শ্বে থাকিয়াও কোনরূপ চিত্ত-বিকার জন্মাইতে পারে না। নগেন্দ্রনাথের তাহাই হইল।

তিনি কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু তাহাতে অধিক দিন অনুরক্ত থাকিতে পারিলেন না। পবিত্র-প্রণয়শালিনী সূর্য্যমুখীর জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন মোহিনী কুন্দনন্দিনী একপার্শ্বে পড়িয়া রহিল আর নগেন্দ্রনাথ পতিপরায়ণা সূর্য্যমুখীর জন্য অনন্যচিত্ত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

মোহ ক্ষণস্থায়ী

নগেন্দ্রনাথের গৃহত্যাগ করিয়া কুন্দ অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রবল ঝড় বৃষ্টির জন্য তাহাকে একটি কুটীরদ্বারে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কুটীরে হীরা বাস করিত। হীরা কুন্দকে তথায় লুকাইয়া রাখিল, অথচ প্রভু এবং প্রভুপত্নী তাহার অনুসন্ধান করিতেছে জানিয়াও কাহাকেও কিছু বলিল না। কুন্দ কিছুদিন তথায় রহিল। প্রিয়তম নগেন্দ্রের অদর্শন অসহ্য হওয়ায়, একদিন রজনী-শেষে হীরার অজ্ঞাতসারে কুন্দ নগেন্দ্রের উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। সূর্য্যমুখী তথায় পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। তিনি কুন্দকে দেখিতে পাইয়া সাদরে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ হইল। সূর্য্যমুখীই এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া স্বামীকে বিবাহে সম্মত করিয়াছিলেন। বিবাহের সংবাদ শুনিয়া স্বামী পুত্রের সহিত কমল-মণি গোবিন্দপুরে আসিলেন। সূর্য্যমুখী সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কমল ও তাঁহার পুত্র সতীশকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বামীর সুখের পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য দেশত্যাগ করিলেন। তাঁহার মানস-

মন্দির-প্রতিষ্ঠিত দেবতুল্য স্বামীর দেবত্ব অন্তরে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি সেই মানস স্বামীকেই অবলম্বন করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন।

যতদিন সূর্য্যমুখী সংসারমধ্যে ছিলেন, ততদিন নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া আনন্দোপভোগ করিতেছিলেন। সূর্য্যমুখী কেন যে তাঁহার একমাত্র সুখসম্পদ্, একমাত্র দেবতা ও আরাধনা, একমাত্র অবলম্বনকে পরহস্তে তুলিয়া দিলেন—এ বিচার করিবার অবসর ততদিন তাঁহার একবারও হয় নাই। তিনি সূর্য্যমুখীকে ভুলিয়া কুন্দের চিন্তায় বিমোহিত ছিলেন। কিন্তু যেদিন সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিলেন, সেইদিন নগেন্দ্রের চেতনা হইল। পূর্ব্বস্নেহ স্মরণ করিয়া তিনি স্বয়ং সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন।

যখন দিনের পর দিন চলিয়া গেল অথচ সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন হইতে নগেন্দ্রের পাষাণ-হৃদয় কোমল হইতে আরম্ভ করিল। বিলাস ও সুখ-সংবর্দ্ধিতা, কুসুম-কোমলা সূর্য্যমুখীর পথপর্য্যটন ও অনাহার-ক্লেশ স্মরণ হওয়ায় তাঁহার অন্তর স্নেহময় হইয়া উঠিল। কুন্দের অমার্জ্জিত প্রেমালাপে ও অতি-পরিমিত সোহাগাদরে তিনি সূর্য্যমুখীর পতিপ্রাণতা অনুভব করিলেন। প্রেমোপভোগে অভ্যস্ত নগেন্দ্রনাথ কুন্দের স্বল্প প্রেম-প্রতিদানে ক্ষুব্ধ হইয়া সূর্য্যমুখীর অনন্ত প্রেমময় হৃদয়খানি চিন্তা করিলেন। তখন সেই প্রণয়িনীর চিন্তা মোহমুগ্ধ নগেন্দ্র-নাথের হৃদয় আচ্ছন্ন করিল এবং অল্পে অল্পে মোহাবরণ ছিন্ন করিয়া মেঘ-নির্ম্মুক্ত আকাশের ন্যায় সে হৃদয় নির্ম্মল করিয়া দিল। তখন সুশীল নগেন্দ্রনাথ মোহ-বিচ্ছিন্ন হইয়া পবিত্র প্রণয়ের প্রভাব এবং সূর্য্যমুখীর অসাধারণত্ব অনুভব করিলেন। তাঁহার তুলনায় কুন্দনন্দিনীর প্রাণ ক্ষুদ্র, প্রণয় ক্ষুদ্র, হৃদয় ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইল।

বাল্যকালে সূর্য্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। যখন বালকবালিকা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তাহাদের প্রকৃতি উত্তরোত্তর

অতি রমণীয় হইয়া উঠে। কোমল লতা ক্ষুদ্র সহকার তরু আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে যেরূপ পরস্পরের গাত্রে বন্ধন-চিহ্ন অঙ্কিত হয়, সেইরূপ একত্র-বর্দ্ধিত যুগ্ম বালকবালিকার হৃদয়-পটে পরস্পরের প্রতিমূর্ত্তি অক্ষয়রূপে অঙ্কিত হয়। একত্র বর্দ্ধিত জীবিত লতা যেরূপ শুষ্ক বৃক্ষকেও দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখে, সেইরূপ আশৈশব-মিলিত দম্পতী-হৃদয় চিরকাল অবিচ্ছিন্ন থাকে এবং মৃত্যুও তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না।

যখন বালক বালিকা উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের হৃদয় শরীর-ধর্ম্ম-প্রভাবে ও সৌন্দর্য্যানুভব-বশতঃ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাহাদের চিন্তা পরিবর্ত্তন এরূপ ধীরে ধীরে সঙ্ঘটিত হয় যে, তাহা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। মোহের প্রভাব তাহারা কখনও বুঝিতে পারে না। বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা পরস্পরের গুণ-গ্রহণে সমর্থ হয়। তখন সেই গুণোপলব্ধি হইতে যে প্রণয় সঞ্চারিত হয় তাহাই কেবল পবিত্র, সুখ-শান্তিদায়ক ও চিরস্থায়ী। যে দম্পতী এই উচ্চস্তরের প্রেমাস্বাদ একবার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আর মোহাচ্ছন্ন হইতে পারে না এবং যদি কখনও মানসিক দুর্ব্বলতায় বা দৈব-বিড়ম্বনায় মোহগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে অচিরেই মোহমুক্ত হইয়া আবার নির্ম্মলভাব ধারণ করে।

নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর মধ্যে এইরূপ প্রেমসঞ্চার হইয়াছিল। তাহার ফলস্বরূপ একজন নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অন্যের সুখ ও শান্তির প্রতি নিয়ত তৎপর হইয়া রহিতেন। ভালবাসিয়াই সুখ পাওয়া যায়—এই ভাব তাঁহাদের মনে জাগ্রত হওয়ায়, পরস্পর প্রতি-দানের অপেক্ষা না করিয়াই ভালবাসিতেন। সুতরাং অভিলাষ প্রকাশ না করা সত্ত্বেও তাঁহাদের মধ্যে অবিরত প্রেম-বিনিময় চলিত।

কিন্তু নগেন্দ্রনাথ রূপজমোহের বশীভূত হইয়া যখন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিলেন, তখন তাঁহার চিত্ত হইতে পবিত্র প্রেমভাব সমূলে উন্মূলিত হইল। তিনি তখন প্রতিদানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসিতে লাগিলেন। ভীরুস্বভাবা বালিকা কুন্দনন্দিনী যে প্রেমানুষ্ঠানে অনভিজ্ঞা, তাহা প্রেমবৃদ্ধ নগেন্দ্রনাথ একবারও বিচার করিলেন না। সুতরাং আদর, সোহাগ, ভালবাসার আশানুরূপ প্রতিদান না পাওয়ায় নগেন্দ্রনাথ অতৃপ্ত হইলেন। তখন কুন্দনন্দিনীর চিন্তা তাঁহার চিত্ত হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে লাগিল।

চেষ্টা করিলে তখনও নগেন্দ্রনাথ কুন্দের প্রতি প্রণয়শালী হইতে পারিতেন। কুন্দের অকপট ভালবাসা ও সম্পূর্ণ আত্মদান হইতে যখন নগেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিতেন যে, তাহার হৃদয় আছে কিন্তু প্রকাশ করিবার ভাষা নাই, অনুভবশক্তি আছে অথচ মোহিনীবিদ্যা নাই, তখন তিনি পুনরায় তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন। কুন্দনন্দিনীর অপার ভালবাসা অচিরেই তাঁহার হৃদয় জয় করিতে পারিত। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ কালের প্রতীক্ষা না করিয়াই বিরক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে কুন্দকে ত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় সূর্য্যমুখীর প্রতি শতধারে প্রবাহিত হওয়ায়, নিরুদ্দিষ্টা সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রণয় পবিত্র ও চিরস্থায়ী

পুরুষ ও স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে কতকগুলি প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৈষম্যের উপর পুরুষের পৌরুষত্ব এবং রমণীর রমণীয়ত্ব নির্ভর করে। এই পার্থক্যের জন্যই পুরুষ ও স্ত্রীর কর্ম্মভূমির পার্থক্য লক্ষিত হয়।

পুরুষ কঠোর, স্ত্রী কোমল। এ বিভিন্নতা যে কেবল তাহাদের শারীরিক গঠনের, তাহা নহে, অন্তরেও এ বিভিন্নতা বিদ্যমান আছে। পুরুষ কোন কার্য্যে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আলোচনা করে, লাভালাভ ফলাফল বিচার করিয়া কার্য্য আরম্ভ করে, কিন্তু স্ত্রী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্যে রত হয়; যে কার্য্য মনোমত না হয়, তাহা কখনও করে না এবং যাহাতে প্রবৃত্তি যায়, তাহা প্রাণ দিয়াও সম্পন্ন করে। পুরুষ কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া বা আংশিক সম্পন্ন করিয়া তাহা সহজে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রী সেরূপ পারে না। পুরুষ ও স্ত্রী-প্রকৃতির এই স্বাভাবিক বৈষম্যের জন্যই প্রত্যহ জগতে সুখ-দুঃখের এত ঘটনার সূচনা হইতেছে।

প্রণয়-ব্যাপারে পুরুষ ও স্ত্রী-প্রকৃতির প্রভাব অত্যন্ত অধিক। পুরুষ যখন ভালবাসে তখন সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীকে আত্মদান করে না, কিন্তু স্ত্রী যখন ভালবাসে তখন অবশিষ্ট কিছুই রাখে না—নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত যেন প্রণয়ীর মধ্যে রাখিয়া দেয়। পুরুষ ও স্ত্রীচরিত্রের এই বিভিন্নতার জন্য পুরুষ একের অঙ্কস্থিত হইয়াও অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত হইতে পারে, কিন্তু স্বামী-সোহাগিনী স্ত্রী সাধারণতঃ অন্য পুরুষের চিন্তা পর্য্যন্তও হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না। এই জন্যই সংসারে পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা অধিক পরিমাণে

মোহাক্রান্ত হয়; কিন্তু প্রকৃতিগত কঠোরতা-বশতঃ সতত প্রলোভন-বেষ্টিত থাকিয়াও সকলে মুগ্ধ হয় না। স্ত্রী যদি কখনও মোহাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারে না—প্রলোভনমধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন হয়।

পুরুষ মোহ-মুগ্ধ হইয়াও কখনও কখনও আত্মরক্ষা করিতে পারেন। দুঃখের জীবনে চৈতন্যলাভ করিলে কিংবা সাধুচরিত্রের প্রভাবে মোহবিচ্ছিন্ন হইলে পুরুষ যখন আত্মদুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া ব্যথিত হয়, তখন তাহার চিত্ত স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষাও নির্ম্মল হইয়া উঠে। এরূপ পরিবর্ত্তন পুরুষ-চরিত্রে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীচরিত্রে অতি বিরল। মোহ অপগত হইলে, পুরুষ যখন পশ্চাত্তাপের যন্ত্রণা অনুভব করে, তখন পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সকল প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে পারে; এমন কি, প্রায়শ্চিত্ত যদি পাপের উপযুক্ত বলিয়া মনে না হয়, তাহা হইলে আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

সূর্য্যমুখীর জন্য নগেন্দ্রনাথের অনুশোচনা আরম্ভ হইল। সংসার-সুখে বিসর্জ্জন দিয়া, মোহের বস্তু কুন্দনন্দিনীকে ত্যাগ করিয়া, তাঁহার যত্ন ও আদরের সকল সামগ্রী বিস্মৃত হইয়া নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বদেশ ও স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া এবং স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া যখন তিনি কাশীধামে উপনীত হইলেন, তখন এক ব্রহ্মচারীর পত্রে জানিলেন যে, সূর্য্যমুখী মরণান্তক ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া মধুপুর-গ্রামে হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন। অন্তিমকালে স্বামীর শ্রীচরণ-দর্শন-মানসে সূর্য্যমুখী ব্রহ্মচারীকে দিয়া এই পত্র লিখাইয়াছেন। পত্র পাইয়াই নগেন্দ্রনাথ মধুপুর যাত্রা করিলেন, কিন্তু পত্র অনেক বিলম্বে তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছিল বলিয়া তথায় তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধি হইল না। মধুপুরে গিয়া নগেন্দ্র সংবাদ পাইলেন যে, সূর্য্যমুখী প্রায়

আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ বৈষ্ণবীর গৃহদাহে সূর্য্যমুখী ভস্মীভূত হইয়া যান।

নগেন্দ্রনাথ মধুপুর ত্যাগ করিলেন। নিজেকেই সূর্য্যমুখীর মৃত্যুর একমাত্র কারণ স্থির করিয়া স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রতিমুহূর্ত্তে সূর্য্যমুখীর প্রতিমা তাঁহার মানসনেত্রের সম্মুখে উদিত হইতে লাগিল। সূর্য্যমুখীর সুখের দিনের দৈনিক প্রতিকার্য্য শরীর গ্রহণ করিয়া নগেন্দ্রের মানসনেত্রের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। সেই বিভিন্নরূপ দর্শন করিয়া নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর বিভিন্নভাব উপলব্ধি করিলেন। তিনি দেখিলেন—কখনও তাঁহার প্রাণস্বরূপা, হৃদয়াসনস্থিতা, আদরিণী সূর্য্যমুখী সুহৃতের ন্যায় তাঁহার অবস্থা-বিপর্য্যয়ে অংশভাগিনী হইতেছেন; কখনও ক্লান্ত নগেন্দ্রনাথকে স্নেহাস্পদ মনে করিয়া সূর্য্যমুখী সহোদরার মত যত্ন ও সেবা করিতেছেন; কখনও বা বিপন্ন নগেন্দ্রনাথ স্নেহরূপিণী দয়াময়ী মাতৃস্বরূপা সূর্য্যমুখীর উদার হৃদয়তলে নির্ভয়ে আশ্রয় লইতেছেন; আবার কখনও নগেন্দ্রনাথের সাধুবৃত্তি ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে বিমোহিতা হইয়া সূর্য্যমুখী ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিতেছেন। নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন—উৎসবের দিনে এক সূর্য্যমুখী দ্বাদশ হইয়া কর্ম্মে সহায়তা করিতেছেন; সুখের দিনে আপনা হারাইয়া সুখভোগ ও সুখবর্দ্ধন করিতেছেন; সংসারের প্রতি-কর্ম্মে সহায়তা করায় এবং নগেন্দ্রের প্রতিকার্য্যে ও অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকায়, তিনি সর্ব্বত্রই সূর্য্যমুখীর সাহচর্য্য অনুভব করিতেছেন। আবার দেখিলেন—নিখিল-বিরাজিতা, চিরানন্দ-দায়িনী সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথকে কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য দেখিয়া শিক্ষা দিতেছেন; কখনও সেবা-পরায়ণা দাসীর ন্যায় সূর্য্যমুখী তাঁহার সেবায় নিযুক্তা রহিয়াছেন; কখনও বা সেই সূর্য্যমুখী লক্ষ্মী-স্বরূপা হইয়া সংসারে মঙ্গলবিধান করিতেছেন এবং সময়ে সময়ে শুদ্ধাচারিণী সূর্য্যমুখী ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া সকলের চিত্তে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিতেছেন।

স্ত্রীর চিন্তায় নগেন্দ্রনাথ অধীর হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বশরীরে তিনি একটা অবসন্নতা অনুভব করিলেন; তাঁহার দৃষ্টি-শক্তি যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। সূর্য্যমুখীর অদর্শনে তিনি চিত্তের আনন্দ, অন্তরের শান্তি, কার্য্যে উৎসাহ ও বিপন্নিরারণের বুদ্ধি হারাইলেন। তখন নগেন্দ্রের চৈতন্য প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় তিনি ভাবিলেন—প্রাণপ্রিয়া সূর্য্যমুখী আমার, তুমি "আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ"—তুমি কোথায়?

নগেন্দ্র ভাবিলেন—"সূর্য্যমুখী, তোমাকে হারাইয়া আমি সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি। তুমিই আমার ইহলোকের শান্তি ও পরলোকের পুণ্য ছিলে, তুমিই আমার বর্ত্তমানের সুখ ও ভবিষ্যতের আশা ছিলে। তোমার বিহনে আজ আমার সকলই গিয়াছে; এখন আছে মাত্র—অতীতের স্মৃতি। আমি সেইটুকু লইয়াই থাকিব। বাকী যাহা আছে, তাহা তোমার; সুতরাং তোমার কাজে সকলই ব্যয় করিব।"

গুরুতর পাপের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। নগেন্দ্র যতই সূর্য্যমুখীসম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন, ততই তাঁহার অন্তর অনুশোচনার বৃশ্চিকদংশন সহ্য করিতেছিল। মধুপুর হইতে প্রত্যাগমনকালে যখন তিনি শিবিকারোহণ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন সূর্য্যমুখীর দুঃখের অবস্থার কথা মনে পড়িল। যখনই তাঁহার মনে হইল যে সূর্য্যমুখী পদব্রজে পথবাহন করায় রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তখন শিবিকারোহণসুখ তাঁহার নিকট অসহ্য হইল। নগেন্দ্রনাথ সেই মুহূর্ত্তে শিবিকা ত্যাগ করিলেন এবং কলিকাতা পর্য্যন্ত অবশিষ্ট পথ পদব্রজে অতিবাহিত করিলেন।

সূর্য্যমুখীর দুঃখের কথা যেমন একটী একটী করিয়া তাঁহার চিত্তমধ্যে উদিত হইতে লাগিল, নগেন্দ্রনাথও সেই সেই দুঃখ স্বয়ং ভোগ করিতে

সঙ্কল্প করিলেন। অনাহার, অর্দ্ধাহার ও কদন্ন ভোজনে তাহার দিনপাত হইত বলিয়া তিনিও মাত্র জীবনধারণোপযোগী আহার্য্য গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন। সূর্য্যমুখী বৃক্ষতলে বা পর্ণগৃহে রাত্রি-যাপন করিতেন বলিয়া তিনিও গৃহত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এভাবে জীবন যাপন করিতে হইলে অতি সামান্য অর্থের প্রয়োজন হয়। নগেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন—যিনি আমার সুখ ছিলেন এবং যাঁহার সহিত আমার সকল সুখ গিয়াছে, যাঁহার জন্য আমি প্রাণান্ত পর্য্যন্ত করিব, তাঁহার উদ্দেশ্যে আমার জীবদ্দশায় আমার সকল জিনিষই ব্যয়িত হইবে। সূর্য্যমুখী কমলকে ভালবাসিতেন; তাঁহার জিনিষ কমলকে ব্যবহার করিতে দেখিলে সূর্য্যমুখীর আত্মা সুখবোধ করিবে। সুতরাং অস্থাবর সকল সম্পত্তি কমলকে দান করিবেন স্থির করিলেন। স্থাবর-সম্পত্তি ভাগিনেয় সতীশচন্দ্রকে দান করিবেন এবং দানপত্রে এরূপ ব্যবস্থা থাকিবে যে, আমার জীবদ্দশায় অর্দ্ধেক আয় অনাথা স্ত্রীলোকের সেবা ও পরিচর্য্যায় সতীশ ব্যয় করিবে। নিজের দিনপাতের উপায়-স্বরূপ আপনার সঙ্গে কতকগুলি কাগজ রাখিবেন। অতি দীনভাবে প্রাণধারণ করিয়া যে উদ্‌বৃত্ত অর্থ পাইবেন, তাহা দ্বারা এবং শরীর পাত করিয়া দুঃস্থা স্ত্রীলোকের উপকার করিবেন। আর সঙ্গে রাখিবেন—সূর্য্যমুখীর অলঙ্কার। সেগুলি কখন হস্তান্তরিত কবিবেন না এবং জীবনের শেষদিনে সেইগুলি দেখিতে দেখিতে দেহত্যাগ করিবেন।

এই ত সূর্য্যমুখীর মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু ইহাতেও ত সূর্য্যমুখীকে পাওয়া যাইবে না। মোহবশতঃ যাঁহাকে কিছুকালের জন্য হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাকে হৃদয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নগেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন—যে শয্যায় সূর্য্যমুখী শয়ন করিতেন, যাহার সহিত তাঁহার সকল স্মৃতি বিজড়িত আছে, তাহাতে একবার শয়ন

করিবেন। একবার চক্ষের জলে অন্তর নির্ম্মল করিয়া তিনি সূর্য্যমুখীর স্মৃতি হৃদয়ে তুলিয়া লইবেন এবং সেই স্মৃতি অবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন। অনুশোচনার তীব্র দহনে দগ্ধ হইয়া নগেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক অবস্থা হইতেও পবিত্রতর হইলেন।

হায় মানুষের জীবন! এই পৃথিবীতে কাহারও ভাগ্যে কি সম্পূর্ণ সুখভোগ হইতে পারে না? বিধাতা সুখেরই পরিমাণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের কোন পরিমাণ করেন নাই কেন? সুখের পরিমাণ থাকার জন্যই কি একবার প্রথম-জীবনে সুখভোগ করিলে উত্তরকালে অনন্ত দুঃখ পাইতে হয়? নগেন্দ্রনাথ, তোমার অপেক্ষা কয়জন অধিক সুখোপকরণ এই সংসারে পায় এবং কয়জনই বা এত সুখভোগ করিতে পারে? পৃথিবীর যাহা সুখ, যাহা বাঞ্ছিত—সে সকলই তুমি পাইয়াছিলে। লোকে যাহা পাইবার জন্য কত প্রয়াস, কত সাধনা করিতেছে, তুমি তাহা আপনা হইতেই পাইয়াছিলে, কিন্তু সুখী হইতে পারিলে কি? লোকে যাহা পায় না, তাহা তুমি পাইয়াছ; কিন্তু একটির অভাবে এত আয়োজন ব্যর্থ হইল। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন কে সংসারে সুখী হইতে পারিয়াছে?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অনুশোচনা

ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া নগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় শ্রীশচন্দ্রের বাসায় আসিলেন। পথবাহনকালে তিনি যেরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই তাঁহার সম্পত্তির দানপত্র লিখিলেন। শ্রীশচন্দ্রের নিষেধ ও অনুরোধ তাঁহাকে এ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। পিতৃ-পিতামহের আবাস, অতুল সম্পত্তি, বিবিধ বিলাসোপকরণ-মণ্ডিত তাঁহার নিজের বাসভবন ও সখের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যাদি চিরকালের মত ত্যাগ করিতে নিমেষের জন্যও তিনি কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। সূর্য্যমুখীর বিরহে তাঁহার সকলসুখভোগ্য বস্তুই বিষবৎ ত্যাজ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যে বিলাসিতাপ্রিয় ও ভোগরত, যে আত্মতৃপ্তির জন্য উপভোগ করে, যাহার চিত্ত ভোগবিলাসে আকৃষ্ট, সে চিরকালের জন্য ভোগপ্রবৃত্তি উন্মূলিত করিয়া বাসনা-পূরণ-সমর্থ উপকরণ ত্যাগ করিতে পারে না। মানসিক উত্তেজনা-হেতু বিরাগ জন্মিলেও তাহা অতি ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। কিন্তু যে অন্যের সুখ হইবে মনে করিয়া বা অন্যকে সুখী দেখিবার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার বিলাসসামগ্রী উপভোগ করে, তাহার চিত্ত কখনও সুখোপকরণের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে না। সেই প্রেমাস্পদের অবলম্বনই তাহার সুখ সংবর্দ্ধিত করে—বিলাস এবং বিহার কেবল উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া থাকে। প্রেমাস্পদ হইতে বিচ্যুত হইলে, এই শ্রেণীর লোক চিত্ত সংযত করিয়া চিরকালের জন্য ভোগ-বাসনা ত্যাগ করিতে পারে।

বিবাহ-সংস্কার এই অসাধ্য-সাধনকে স্বাভাবিক উপায়ে সহজ করিয়া দেয়। প্রথম প্রণয়সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর চিত্ত যখন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন একজন অপরকে সুখী করিবার ও সুখী দেখিবার জন্য কতকগুলি কার্য্য আরম্ভ করে। যদিও সেই কার্য্য প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেহই তাহাতে সম্পূর্ণ মুগ্ধ হয় না। সুতরাং স্ত্রীর অবর্ত্তমানে স্বামী সেই সকল কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে বা স্বামীর বিরহে স্ত্রী মিলনের দিনের সকল প্রকার সুখ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে মুহূর্ত্তের জন্য দ্বিধাবোধ করে না।

ধনিপুত্র নগেন্দ্রনাথ ভোগ-সুখের মধ্যে প্রতিপালিত হইলেও কখনও ভোগাকাঙ্ক্ষার দাস ছিলেন না। সূর্য্যমুখী সুখবোধ করিবেন মনে করিয়াই তিনি তাঁহার অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিতেন। সুতরাং যেদিন হইতে সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া যাইলেন, সেইদিন হইতেই চিরাভ্যস্ত সুখোপকরণ অতৃপ্তিকর বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। কিন্তু যখন নগেন্দ্রনাথ শুনিলেন যে সূর্য্যমুখীর মৃত্যু হইয়াছে, তখন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করা তাঁহার নিকট বিচিত্র বলিয়া বোধ হইল না। তাঁহার সুখদাত্রী সূর্য্যমুখী যে পথে গিয়াছেন, তখন সেই পথই তাঁহার একমাত্র বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিল।

কলিকাতা হইতে নগেন্দ্রনাথ পদব্রজে গোবিন্দপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং শ্রীশচন্দ্র কমলমণিকে লইয়া নৌকাযোগে আসিতে-ছিলেন। নগেন্দ্রের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কমলমণি গোবিন্দপুরের বাটীতে উপনীত হইলেন এবং চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্রের আগমন-বার্ত্তা জানাইয়া সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস করিলেন। শোকক্লিষ্ট কুন্দনন্দিনীর অধরপ্রান্তে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল দেখিয়া কমল স্বস্তিবোধ করিলেন। কিন্তু সে হাসি যে কৃষ্ণকাদম্বিনী-মধ্যগত বিদ্যুৎ-বিলাসের মত ক্ষণস্থায়ী হইয়া বিষাদান্ধকারে চিরমগ্ন হইবে, তাহা কি কেহ বুঝিয়াছিল?

সন্ধ্যাকালে নগেন্দ্রনাথ স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন ধীর এবং গম্ভীরভাবে তিনি সকল পুরবাসীর সহিত আলাপ করিলেন এবং রাত্রি অধিক হইলে সূর্য্যমুখীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সকলের সহিত নগেন্দ্র দেখা করিলেন ; তাঁহার দর্শন হইতে বঞ্চিত হইল কেবল কুন্দনন্দিনী।

কুন্দ যদি নগেন্দ্রের প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী হইত, তাহা হইলে কি তাহাকে এই ভাবে স্বামী সন্দর্শন হইতে বঞ্চিত হইতে হইত? যদি কোন বিশেষ কারণবশতঃ স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হইয়া নিজেকে স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলেও স্ত্রী স্বামীর অদর্শনে উদ্বিগ্ন ও বিরহানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া দাম্পত্যপ্রণয়ের আকর্ষণে আপনিই স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং পূর্ব্বপ্রণয় স্মরণ করাইয়া প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হয়। তখন তাহাদের সকল অসন্তোষ দুরীভূত হয় এবং প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি হৃদয় সম্মিলিত হয়। ইহাই বিবাহ-সংস্কারের বৈচিত্র্য। বিবাহরাত্রির অব্যবহিত পরেই স্বামী-স্ত্রী রূপজ-মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই মোহ অপগত হইয়া পবিত্র প্রণয় সঞ্চারিত হয়। প্রণয় তখন দুইটি হৃদয়কে আবদ্ধ করিয়া একের প্রতি অন্যের চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া রাখে। তখন স্বেচ্ছাকৃত বিচ্ছেদ তাহাদের মধ্যে অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না।

যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রণয়-সঞ্চার হয় না এবং মোহবশতঃ একজন অন্যের প্রতি অনুরক্ত থাকে, তখন অতি সামান্য কারণেও পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে। যদি কোন কারণে মোহ অপগত হয় বা একের প্রতি অন্যের বিরাগ জন্মে, তাহা হইলে দম্পতী-হৃদয় হইতে পরস্পরের দর্শনাকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হয়।

রূপজ-মোহে আক্রান্ত হইয়া বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথম স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে যখন

তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা-সম্বন্ধে আলোচনা বা বিচার করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছিল। তাঁহার পাশব-বৃত্তি যে কতদূর প্রবল হইয়াছিল এবং তাঁহাকে অবনতির পথে কতদূর লইয়া গিয়াছিল তাহা সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তখন হইতে ক্রীড়া-পুত্তলি কুন্দনন্দিনীর প্রতি বিরক্তির সূচনা হইল। পরিশেষে সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ায়, তিনি কুন্দকেই সকল দুঃখের কারণ স্থির করিলেন। সেইজন্য যখন জাগতিক সকল সুখের আশা উন্মূলিত করিয়া নগেন্দ্রনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তিনি কুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্বামী-স্ত্রীর হৃদয় অভিন্ন

রাত্রি অধিক হইলে নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর গৃহে শয়ন করিতে গেলেন। যখন তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল। প্রবল বায়ু উন্মুক্ত দ্বারদেশ দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রতিঘাত হইয়া কবাট শব্দায়মান করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে বর্ষণ হওয়ায় মেঘান্তর্নিহিত জলভার কিঞ্চিৎ লঘু হইতেছিল।

বিপুল শোকভারাক্রান্ত নগেন্দ্রনাথ যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়াকাশ বর্হিজগতের অনুরূপ ভাব ধারণ করিয়াছিল। চিন্তা-স্রোত উন্মুক্ত হৃদয়-দ্বারে প্রতিঘাত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসরূপে সশব্দে বাহির

হইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে অশ্রুবর্ষণ হওয়ায় তাঁহার বিরহ-ক্লিষ্ট হৃদয় কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইতেছিল।

নগেন্দ্রনাথের সুখময় জীবনের, সূর্য্যমুখীর সহিত মিলনের দিনের সকল চিহ্নই তখনও সে গৃহে যথাযথ বর্ত্তমান ছিল। স্বামীর চিত্তবিনোদনাভিলাষের, সূর্য্যমুখীর প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের ও তাঁহার পতিভক্তির সকল নিদর্শন তখনও বিদ্যমান ছিল। ইহকাল ও পরকালের পরিত্রাতা পতিদেবতার স্থাপনার জন্য সূর্য্যমুখী যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আজ সেই মন্দির-মধ্যে নগেন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পূজারতা, ভক্তিমতী, পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী আজ কোথায়? তাঁহার সকল চিহ্ন অবিকৃত রহিয়াছে, কিন্তু যাঁহার ইচ্ছায় সেই সকল জিনিষ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাঁহার দর্শন আর কি কখনও পাওয়া যাইবে?

মোহমুক্ত নগেন্দ্রনাথ নির্ম্মল-চিত্তে সূর্য্যমুখী-সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনুশোচনার তীব্রদহনে ততই তাঁহার চিত্ত পবিত্র ও প্রেমপূর্ণ হইতে লাগিল। তখন তিনি সূর্য্যমুখীর স্মৃতি-বিজড়িত যে সোফায় বসিয়াছিলেন, তাহাকেই সূর্য্যমুখী মনে করিয়া আদর ও সোহাগ প্রদর্শনার্থে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। কাল্পনিক সূর্য্যমুখীর সাহচর্য্যে সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া যখন নিশাবসানে নগেন্দ্র শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন, তখন তৈলহীন দীপের ক্ষীণালোকে শয্যাপার্শ্বস্থ দ্বারদেশে এক স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। স্ত্রী-মূর্ত্তি সূর্য্যমুখীর আকৃতি-বিশিষ্টা বোধ হওয়ায় যেমন তিনি তাঁহাকে পাইবার জন্য ধাবিত হইলেন, অমনি ছায়া অদৃশ্য হইল। তখন নগেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া গৃহতলে পতিত হইলেন।

অন্তরের সহিত সূর্য্যমুখীর ধ্যানে নিযুক্ত থাকায় নগেন্দ্রনাথ সর্ব্বত্রই এবং সকল জিনিষেই সূর্য্যমুখীর অস্তিত্ব অনুভব করিতেছিলেন। যখন জড়পদার্থকেই সূর্য্যমুখী-ভ্রমে তিনি সাদরে আলিঙ্গন করিতেছিলেন, তখন

বাস্তব-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি যে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য অধীর হইয়া ধাবিত হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই থাকিতে পারে না। যখন স্ত্রী-মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল, তখন ধৈর্য্যচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি মোহপ্রাপ্ত হইলেন।

মোহাবেশে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর স্বপ্ন দেখিলেন। যখন চৈতন্যপ্রাপ্তি হইল, তখন সূর্য্যমুখীর অঙ্কে মস্তক রক্ষা করিয়া শুইয়া আছেন বলিয়া অনুভব করিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিয়া নগেন্দ্র উঠিয়া বসিলে, সেই রমণী গৃহ হইতে বহির্গত হইবার জন্য দ্বারোদ্দেশে গমন করিলেন। সেই স্ত্রী-মূর্ত্তির অঙ্গভঙ্গিমা নিরীক্ষণ করিয়া সন্দিগ্ধ-চিত্তে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া নগেন্দ্র কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"দেবীই হও আর মানুষই হও, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমার সঙ্গে একবার কথা কও। নচেৎ আমি মরিব।"

রমণী উত্তর দিলেন। যেমন তাঁহার কণ্ঠস্বর নগেন্দ্র শুনিলেন, অমনি সেই রমণীকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। তাঁহার শরীর ও মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল; সুতরাং ঘটনা-বিপর্য্যয় অসহনীয় হওয়ায় তিনি পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন।

যখন মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন প্রভাতালোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই আলোকে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু সূর্য্যমুখী যে জীবিতা থাকিতে পারেন, এ বিশ্বাস তাঁহার হইল না। সুতরাং স্বীয় দুষ্কৃতির চরম প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে মনে করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন—"আমি কি পাগল হইলাম?—না সূর্য্যমুখী বাঁচিয়া আছেন? শেষে এই কি কপালে ছিল? আমি পাগল হইলাম!"

নগেন্দ্র ধরাশায়ী হইয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন। তখন সূর্য্যমুখী স্বামিপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পদযুগল গ্রহণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "উঠ, উঠ! আমার জীবনসর্ব্বস্ব! মাটী ছাড়িয়া উঠিয়া বোস।

আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ, উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি।”

এই সুখের মিলন! যে চির-আদরের চির-সঙ্গিনী ও সকল ব্যথার ব্যথী, যাহাকে লইয়া জীবনের সুখ-দুঃখ গ্রথিত, যাহার সহিত ইহকাল ও পরকালের সম্বন্ধ এবং যাহার অবলম্বনে সংসার সংসার বলিয়া অনুভূত হয়—চির-বিচ্ছেদের পর সেই প্রাণপ্রিয়ার সহিত মিলন যে কত সুখের, কত অপার্থিব, কত অমূল্য, তাহা কেবল অনুভবযোগ্য—বর্ণনাতীত। যে সূর্য্যমুখীর মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া নগেন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া সংসার ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আজ সেই প্রাণাধিকার আকস্মিক আবির্ভাবে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইল। তখন অশ্রুপ্রবাহ অবাধগতিতে নির্গত হইয়া কণ্ঠলগ্না সূর্য্যমুখীর বক্ষবস্ত্র আর্দ্র করিল এবং সূর্য্যমুখীর নয়নজলে নগেন্দ্রনাথের শরীর অভিষিক্ত হইল। বিরহী ও বিরহিণীর মধ্যে কোন প্রেমালাপ হইল না—কেবল অন্তর এবং বাহিরের মিলন। এরূপ মিলন কত সুখের!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বহুবিবাহের কুফল

নদীর গতির সহিত প্রেমের গতির এক অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। নদী যেরূপ উভয় তীরের মধ্যে নির্ম্মল জলরাশি বহন করে এবং উভয় তীর-ভূমিকেই সেই জলের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া রাখে, প্রেমও সেইরূপ

স্ত্রী-পুরুষের উভয় অন্তরমধ্যে এক পবিত্রভাব ধারণ করিয়া থাকে এবং তাহারই আকর্ষণে দুইটী বিভিন্ন হৃদয়কে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ও সংযুক্ত করিয়া রাখে। নদীবক্ষে তরঙ্গ সঞ্চালিত হইলেও যেমন এপার ওপার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, সেইরূপ দম্পতীজীবনে ঘাতপ্রতিঘাত হইলেও প্রেমের প্রভাবে একের চিত্ত অন্য হইতে বিচলিত হইতে পারে না। প্রবল-বায়ু-সঞ্চালিত হইয়া নদী ভীষণভাবে তরঙ্গিত হইলে জলরাশি যেরূপ উভয় কূল ক্ষয়িত করিয়া মৃত্তিকা ও বালুকাকণা আপন শরীরে মিশাইয়া দেয়, সেইরূপ সাংসারিক সংঘর্ষ ও মনোমালিন্য স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রের কুটিলতা বিনষ্ট করিলে, প্রেমই দৃঢ়তররূপে দুইটী হৃদয়কে আবদ্ধ করে। এই সাদৃশ্যের জন্য কবির চক্ষে নদী এত সুন্দর, এত নয়ন-মন মুগ্ধকর।

পর্ব্বতগাত্র বা কোন উচ্চতর স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া নদী সমতল-ভূমির মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অন্য কোন বড় নদীতে বা সমুদ্রে বিলীন হয়। নদীর গতি বিশেষ বক্র না হইলে বা তাহার গতিরোধ করিয়া স্থানে স্থানে প্রতিবন্ধক না থাকিলে স্রোত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে, কিন্তু প্রতিবন্ধক থাকিলে জল আর প্রবাহিত হইতে পারে না। তখন বদ্ধ জলরাশি সম্মিলিত হইয়া প্রবলবেগে গতিরোধকারী বন্ধন ভেদ করিয়া দুর্দ্দমনীয় বেগে ধাবিত হয় এবং অবরোধকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রবাহমধ্যে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সেইরূপ দম্পতীজীবনে যতদিন কোন বিরোধ না ঘটে বা স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়পথে যতদিন কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হয়, ততদিন প্রণয় তাহার স্বাভাবিক সরল মৃদুগতিতে বাড়িতে থাকে, কিন্তু একবার বিচ্ছেদ ঘটিলে বিরহাবস্থায় পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। বিরহের দিনে দৈবানুগ্রহে যদি স্বামী-স্ত্রীর মিলন সংঘটিত হয়, তাহা হইলে প্রণয়াকর্ষণ তাহাদের হৃদয়কে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ করে এবং সময়ে সময়ে বিচ্ছেদকারীকেও প্রেমাবদ্ধ করে।

নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর জীবনে এইরূপ ঘটনাই ঘটিল। প্রগাঢ় প্রণয়াবদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কুন্দ বিচ্ছেদ ঘটাইল। বিরহাবস্থায় যখন তাঁহারা দিন কাটাইতে ছিলেন, তখন তাঁহাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি এরূপ নিবিষ্ট হইয়াছিল ও প্রেমপরিসর এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, মিলনের দিনে বিচ্ছেদকারিণীকে ঘৃণা বা ঈর্ষার চক্ষে না দেখিয়া তাঁহারা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। সূর্য্যমুখী কুন্দনন্দিনীকে কনিষ্ঠা ভগ্নী মনে করিয়া স্নেহের চক্ষে দেখিলেন এবং কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রনাথের চক্ষে আনন্দদায়িনী-মূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইল।

নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর মিলনের পর সূর্য্যমুখী পুরবাসিনী সকলের সহিত আলাপ সম্ভাষণ শেষ করিয়া কমলমণির সহিত কুন্দকে দেখিতে গেলেন। যে কুন্দ বালিকা বয়স হইতেই সূর্য্যমুখীর হস্তে পালিতা, আজ তাহাকে ভগিনীর মত স্নেহ ও আদর করিবার জন্য সূর্য্যমুখী তাহার নিকট গেলেন, কিন্তু তাহার শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সকল আশা নির্ম্মূল হইল।

কমল ও সূর্য্যমুখী দেখিলেন—কুন্দ খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া গৃহতলে বসিয়া আছে। তাহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষু তেজোহীন এবং কোটরগত; শরীর অবশ হইয়া পড়িয়াছে। কুন্দের অবস্থা দেখিয়া ও তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, কুন্দ বিষপান করিয়াছে। তখন কমলমণি ভীতা হইয়া নগেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। নগেন্দ্র কুন্দের গৃহের নিকট আসিলে, সূর্য্যমুখী তাঁহাকে কুন্দের অবস্থা জানাইলেন এবং তথায় তাঁহাকে থাকিতে বলিয়া নিজে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

নগেন্দ্রনাথ কুন্দের দিকে অগ্রসর হইলেন। পুরুষ যতক্ষণ স্ত্রী হইতে দূরে থাকে, ততক্ষণ সে তাহার চিত্তের দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। কিন্তু একবার স্ত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইলে আর তাহার সেরূপ কঠোরতা থাকে না।

নগেন্দ্রের চিত্ত পূর্ব্ব হইতেই কোমল হইয়াছিল। এখন কুন্দের নিকট যাইবামাত্রই যখন সে তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল, তখন নগেন্দ্র আবেগভরে বলিলেন—"এ কি কুন্দ! তুমি কি দোষে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?"

কুন্দনন্দিনী উত্তর করিল—"তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?" সে পুনরায় সোহাগ ও প্রেমপূর্ণস্বরে বলিল—"কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে—তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্পদিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।"

নগেন্দ্রনাথ কখনও কুন্দের নিকট হইতে ভাষায় প্রেমপ্রতিদান পান নাই বলিয়া তাহার নীরব হৃদয় একেবারেই চিনিতে পারেন নাই। আজ এই অন্তিমকালে স্বামীর সম্মুখে বসিয়া যখন কুন্দ আপন উদার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গভীর প্রেম ও পতিপ্রাণতার পরিচয় দিল, তখন নির্ব্বাক্ হইয়া নগেন্দ্র কুন্দের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।

আত্মদুষ্কৃতির অনুশোচনায় হতবুদ্ধি ও জড়প্রায় হইয়া যখন নগেন্দ্রনাথ কুন্দের সম্মুখে বসিয়াছিলেন, তখন স্বামীপ্রেমমুগ্ধহৃদয়া স্বল্পভাষিণী সেই যুবতী বলিল—"ছি! তুমি অমন নীরব হইয়া থাকিও না। আমি তোমার হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম—তবে আমার মরণেও সুখ নাই।"

নগেন্দ্র কাতরস্বরে কহিলেন—"কেন তুমি এমন কাজ করিলে? তুমি আমায় একবার কেন ডাকিলে না?" তাঁহার বিশেষ কিছু বলিবার ছিল না; কিন্তু যাহা বলিলেন, তাহাতেই সহানুভূতি ও ভালবাসার পরিচয় পাইয়া কুন্দনন্দিনী অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। অন্তরের

আনন্দ কুন্দের ম্লানমুখে প্রতিভাত হইল। যে ক্ষীণ হাসির রেখা তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল, তাহা নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর মরণাধিকার-গতা কুন্দনন্দিনীর যখন ঈষৎ শক্তি-সঞ্চয় হইল, তখন সে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"আমার কথা কহিবার তৃষ্ণা নিবারণ হইল না—আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম—সাহস করিয়া কখনও মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই। আমার সাধ মিটিল না—আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে—আমার মুখ শুকাইতেছে—জিব টানিতেছে—আমার আর বিলম্ব নাই।" কুন্দ আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া ভূতলে শয়ন করিল। সেই অবস্থায় থাকিয়া—যিনি রমণীর ইহকালের আশ্রয় ও অবলম্বন—সেই পতিদেবতার অঙ্কে থাকিয়া, পরকালের মুক্তিদাতা স্বামীর চরণ-কমলে মুখ ঢাকিয়া, দুঃখিনী কুন্দনন্দিনী প্রাণ-ত্যাগ করিল।

সংসারের শোক-দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া কুন্দ চলিয়া গেল, কিন্তু নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে সে যে স্মৃতি রাখিয়া গেল, তাহা তাঁহার চিত্তে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অঙ্কিত রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পৃথগন্নবর্ত্তিতা

কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে একান্নবর্ত্তিতা সংসারাশ্রমীদিগের আদর্শ ছিল। ভোগ-বাসনা কম থাকায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এক-সংসারে থাকিতে প্রকৃত সুখবোধ করিতেন। এখনও অনেকের মুখে একান্নবর্ত্তিতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাদের জীবন আলোচনা করিলে এবং অন্তর পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারাও স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনের প্রয়াসী; বাধ্য হইয়া এক-সংসারে অন্যের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়া থাকিতে হইলে তাহারাও অতি ক্ষুব্ধচিত্তে কালহরণ করে। একান্নবর্ত্তী হইয়া সুখে কালযাপন করিতে হইলে যে প্রবৃত্তি ও মানসিক শক্তির আবশ্যক, তাহা এখন সাধারণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। সমদর্শিতা, স্বার্থত্যাগ ও অন্যের সুখে আনন্দোপলব্ধি ভিন্ন একান্নবর্ত্তী-পরিবারবর্গ নির্ব্বিবাদে বাস করিতে পারে না।

এখন দেশব্যাপী দরিদ্রতা ও অবস্থার বিভিন্নতার জন্য আমাদের আদর্শের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আধুনিক শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের প্রভাবে আমাদের অন্তর হইতে উচ্চ-অঙ্গের বৃত্তিগুলি সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। রাজপুরুষদিগের সাহচর্য্যে স্বাধীনজাতির ভোগলিপ্সা, স্বতন্ত্রতা ও স্বার্থান্ধভাব এখন আমাদের আদর্শ হইয়াছে। অনুচিকীর্ষু হইয়া আমরা আজকাল স্বতন্ত্রজীবন সুখকর বলিয়া স্থির করিয়াছি এবং অন্যের কর্ত্তৃত্বাধীন না হইয়া স্বোপার্জ্জিত ধন উপভোগ করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করি। এই সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা আজকাল প্রায় সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে অথচ অনেকের ভাগ্যেই সে সুখভোগ ঘটিয়া উঠে

না। সেই জন্য যখন অন্যের কর্ত্তৃত্ববিহীন স্বাধীন সংসারের চিত্র আমরা দেখিতে পাই, তখন আমাদের অতৃপ্ত অন্তঃকরণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তখন আমরা প্রলুব্ধনয়নে সেই সংসারের দিকে চাহিয়া থাকি।

শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির সংসারের চিত্র আমাদের নয়নসমক্ষে উপস্থিত হইয়া এরূপ চিত্তপ্রসাদ জন্মায় যে, আমরা অন্য সকলকে ভুলিয়া স্থির-নেত্রে ঐ স্বামী-স্ত্রীকেই দেখিতে থাকি। তাঁহাদের সুখ ও সুখ-সম্ভোগের সুযোগ দেখিয়া আমরা সুখী হই এবং পরক্ষণেই তাহাদের জীবনের সহিত নিজেদের অবস্থার তুলনা করিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হই। তখন শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির শুভাদৃষ্ট ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিই এবং তাঁহারা যেন সংসারে সকল সুখভোগ করিতে পারেন অন্তরের সহিত ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দম্পতী-জীবন

নগেন্দ্রবাবুর ভগ্নীপতি শ্রীশচন্দ্র মিত্র কলিকাতায় বাস করিতেন। তিনি প্লাণ্ডর ফেয়ারলির বাড়ীর মুৎসুদ্দি ছিলেন। হৌস বড়—সুতরাং অর্থাগম তাঁহার যথেষ্ট হইত। চাকরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে অধিক পরিশ্রম করিতে এবং নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। শ্রীশবাবুকে আপিসে কাজ করিতে হইত এবং সময়ে সময়ে আপিসের খাতা-পত্র বাড়ীতেও দেখিতে হইত।

যদিও শ্রীশচন্দ্রকে অনেক সময় আপিসের কাজে ব্যস্ত থাকিতে হইত, তথাপি তিনি স্ত্রীর সহিত কালযাপন করিতে এবং সস্নেহ সাদর ব্যবহার করিতে কখনও ত্রুটি করিতেন না। স্ত্রীর প্রতি আদর আপ্যায়ন করিতে যে কালক্ষেপ হইত, তাহা তিনি সময়ের অব্যবহার বলিয়া মনে করিতেন না এবং ইহাতে তাঁহার যে সময় অতিবাহিত হইত, তাহার জন্য তিনি কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না।

স্ত্রীর সহিত এরূপ সহৃদয় প্রেমিক ব্যবহার সংসারের কর্ত্তৃপক্ষের এবং সমালোচকের চক্ষে দুর্ব্বলতা বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বামী যদি অবসর-মত স্ত্রীর সহিত আলাপ না করে, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয় না এবং প্রণয়বন্ধনও দৃঢ় হয় না। স্বামী আপন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া যদি সতত উচ্চ-চিন্তায় মগ্ন থাকে এবং গৃহকর্ম্মরতা স্ত্রীর কার্য্যের অনুসন্ধান বা সহায়তা না করে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা কমিয়া যায়। আপন আপন কর্ত্তব্য করিতেছি এবং করিয়া যাইব এরূপ বিবেচনা করিয়া যখন স্বামী-স্ত্রী সংসার করে, তখন তাহাদের মধ্যে প্রেমের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের মধ্যে প্রকৃত অনুরাগ থাকে না এবং দম্পতীজীবন যন্ত্রচালিতবৎ হইয়া যায়।

স্বামী-স্ত্রীর জীবন এরূপ ভাব ধারণ করিলে সংসারের কর্ত্তৃপক্ষগণ কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন না এবং সেইজন্য এ বিষয় তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এরূপ অনুরাগহীন দম্পতী-জীবনের বিষময় ফল সম্বন্ধে যদি তাঁহারা আলোচনা করিতেন এবং সংসারমধ্যে ইহার লক্ষণ দেখিয়া প্রতীকারের চেষ্টা করিতেন অথবা সময় থাকিতে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সুযোগ ঘটাইয়া তাহাদের মধ্যে এভাব জাগ্রত হইতে না দিতেন, তাহা হইলে অনেক সংসার দুঃখের গর্ভে নিহিত হইত না—অনেক সোণার সংসার ছারখার হইত না।

শ্রীশচন্দ্র প্রকৃতিগত প্রেমিকতা দ্বারা প্রণয়বন্ধন এরূপ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সংসারে অবিরল আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইত। তাঁহার সরল শান্তভাব, আন্তরিক সোহাগ ও আদর এবং রমণীহৃদয়াপহারী ব্যবহার দেখিয়া আমরা আনন্দ অনুভব করি। স্ত্রীপ্রেমমুগ্ধহৃদয় শ্রীশচন্দ্রকে যুবতী স্ত্রীর সহিত বালকের মত সরলভাবে রহস্য করিতে দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। যখন কমলমণি স্বামীর নিকট আসিয়া বলিলেন—"গোবিন্দপুরে চুরি হয়েছে। দাদাবাবুর একটী সোণার কৌটায় এক কড়া কাণাকড়ি ছিল, তাই কে নিয়া গিয়াছে" এবং সে কাণাকড়িটি সূর্য্যমুখীর বুদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, তখন শ্রীশচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর করিলেন—"তাই লোকে বলে যে, যে খেলে সে কাণা কড়িতেই খেলে। সূর্য্যমুখী ঐ কাণা কড়িতেই তোমার ভাইকে কিনে রেখেছে—আর তোমার এতটা বুদ্ধি থাকিতেও ভাই"—কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কমলমণি স্বামীর মুখ টিপিয়া ধরিলেন।

আবার কখনও তাঁহাদের মধ্যে কলহ হইত। সে কলহই বা কত সুন্দর। তাহাতে মনোমালিন্য না হইয়া চিত্তপ্রসাদ জন্মায়, হৃদয়ের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। তাঁহাদের সাংসারিক ঘটনা আলোচনা করিলে একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

গোবিন্দপুরে যাইবার জন্য সূর্য্যমুখীর অনুরোধের কথা বলিয়া যখন কমলমণি স্বামীপুত্রসহ ভ্রাতৃভবনে যাইবার প্রস্তাব করিলেন, তখন শ্রীশচন্দ্র যে উত্তর করিয়াছিলেন, তাহাতেই কলহের সূচনা হইল। কিন্তু সে কলহ যে কিরূপ মহাসমরে পরিণত হইল এবং তাহার সন্ধিই বা কিরূপে সংস্থাপিত হইল, তাহা দেখাইবার জন্য ঘটনাটির উল্লেখ করিতেছি। কমলমণি বলিলেন, "শুধু কি তাই! সতীশের নিমন্ত্রণ; আমার নিমন্ত্রণ আর তোমার নিমন্ত্রণ।

শ্রীশ। আমার নিমন্ত্রণ কেন?

কমল। আমি বুঝি একা যাব? আমার সঙ্গে গাড়ু-গামছা নিয়ে যায় কে?

শ্রীশ। এ সূর্য্যমুখীর বড় অন্যায়। শুধু গাড়ু-গামছা বহিবার জন্য যদি ঠাকুর-জামাইকে দরকার হয়, তবে আমি দুদিনের জন্য একটা ঠাকুর-জামাই দেখিয়ে দিতে পারি।

কমলমণির বড় রাগ হইল। সে ভ্রূকুটি করিল, শ্রীশকে ভেঙ্গাইল এবং শ্রীশচন্দ্র যে কাগজখানায় লিখিতেছিল, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিল। শ্রীশ হাসিয়া বলিল, "তা লাগ্‌তে এসো কেন?"

কমলমণি কৃত্রিম কোপসহকারে কহিল, "আমার খুসি, লাগবো।"

শ্রীশচন্দ্র কৃত্রিম কোপসহকারে কহিলেন, "আমার খুসী বল্‌বো।"

তখন কোপযুক্তা কমলমণি শ্রীশকে একটি কিল দেখাইল। কুন্দ-দন্তে অধর টিপিয়া ছোট হাতে একটি ছোট কিল দেখাইল।

কিল দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র কমলমণির খোঁপা খুলিয়া দিলেন। তখন বর্দ্ধিতা-রোষা কমলমণি, শ্রীশচন্দ্রের দোয়াতের কালি পিক্‌দানিতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিল।

রাগে শ্রীশচন্দ্র দ্রুতগতি ধাবমান হইয়া কমলমণির মুখচুম্বন করিলেন। রাগে কমলমণিও অধীরা হইয়া শ্রীশচন্দ্রের মুখচুম্বন করিল।"

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মহাসমর স্থায়ী না হইয়া অচিরেই সমাপ্ত হইল এবং সন্ধি স্থাপিত হইল। যদিও এরূপ সন্ধি অধিকক্ষণ শান্তিরক্ষা করিতে পারিত না, তথাপি ইহাতে যে অন্তরের সন্ধি হইত, তাহা সেই দুইটি হৃদয়কে চিরকালের জন্য সংবদ্ধ রাখিত। একজন অন্যের অবলম্বন হইয়া, একজন অন্যের চিন্তা ও সহায় হইয়া, একজন অন্যের সাধনা ও আরাধনা হইয়া সংসারমধ্যে থাকিতেন। সেইজন্য যখন আমরা শ্রীশচন্দ্রকে বলিতে শুনি—

"তা সত্য সত্যই—কি তোমায় গোবিন্দপুরে যেতে হবে? আমি একা থাকিব কি প্রকারে?" তখন তাঁহাকে স্ত্রৈণ বলিয়া মনে করি না। তখন মনে হয়, সে দুইটি হৃদয় একত্র গ্রথিত, সে দুইটি জীবের এক প্রাণ; তাঁহারা এক বৃন্তে দুটি ফুল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি

শ্রীশচন্দ্রের গৃহে সকল প্রকার সুখোপকরণ ছিল এবং জাগতিক সকল সুখই তিনি উপভোগ করিতেন। কোন আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার অপূর্ণ থাকিত না। তিনি এরূপভাবে বাসনা চরিতার্থ করিতেন যে, কখনও তাঁহাকে ভদ্রতা ও নীতির বাহিরে যাইতে হইত না।

স্ত্রীলোকের সহিত কি ভাবে ব্যবহার করা উচিত সে সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্রের বেশ নিপুণতা হইয়াছিল। নিজের মান খর্ব্ব না করিয়া স্ত্রীকে প্রণয়াভিভূত রাখিবার ক্ষমতা হইয়াছিল বলিয়া তিনি কমলমণিকে আয়ত্তাধীন রাখিয়াও সর্ব্বসুখী করিতে পারিয়াছিলেন। কমলমণির রাজ্যে যদিও কমল রাণী এবং শ্রীশচন্দ্র মন্ত্রী ছিলেন, তথাপি রাণীর বিশেষ প্রভুত্ব ছিল না। মন্ত্রীর অনভিমতে কোন কার্য্য তিনি করিতে পারিতেন না এবং শ্রীশচন্দ্রই সে রাজ্যের প্রকৃত পরিচালক ছিলেন।

স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্রের বেশ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। অভিমানিনী স্ত্রী যে কিরূপ দুর্জ্জয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পতি-সোহাগিনী স্ত্রী

অভিমান করিলে যতই তাহাকে অনুনয় বিনয় করা যাইবে, ততই তাহার মান বৃদ্ধি পাইবে। স্ত্রীলোকের মানভঞ্জন করিতে হইলে অবস্থা বিচার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রেমিক পুরুষেরাই কেবল সে বিচার করিতে সমর্থ এবং তাহারাই কেবল সহজে স্ত্রীর মানভঞ্জন করিয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। শ্রীশচন্দ্র যে এ কার্য্যে বিশেষ পটু ছিলেন, তাহা নিম্ন-লিখিত উদাহরণ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

একদিন মধ্যাহ্নে যখন দাসদাসী সকলেই নিদ্রাভিভূত বা নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যস্ত, তখন কমলমণি শয়ন-গৃহে বসিয়া কার্পেট্ বুনিতেছিলেন। অধিকক্ষণ সে কার্য্য ভাল না লাগায় হস্তস্থিত কার্য্য রাখিয়া দিলেন এবং বহুক্ষণ একাকী থাকিতে হওয়ায় অধীরা হইয়া স্বামী-সম্বন্ধে পুত্র সতীশের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি আজ মর্ম্মে মর্ম্মে স্বামীর অনুপস্থিতি অনুভব করিতেছিলেন এবং স্বামী তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া আপিস হইতে শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া আসেন না বলিয়া দুঃখিতা হইয়াছিলেন। অভিমানভরে কমলমণি মনে মনে বলিতেছিলেন, "আপিস কি ফুরায় না? সতুবাবু, আজ এস আমরা রাগ করিয়া থাকি। অপরাহ্নে যথাকালে শ্রীশবাবু আপিস হইতে আসিলে কমলমণি তাঁহাকে জল খাওয়াইলেন এবং পরে রাগ করিয়া ছেলেকে লইয়া খাটের উপর শুইলেন।

কমলের রাগ দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র হাসিতে হাসিতে হুঁকা লইয়া দূরে কৌচের উপর বসিলেন। হুঁকাকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, "হে হুঁক্কে! তুমি পেটে ধর গঙ্গাজল, মাথায় ধর আগুন! তুমি সাক্ষী, যারা আমার উপর রাগ করেছে, তারা এখনি আমার সঙ্গে কথা কবে—কবে—কবে! নহিলে আমি তোমার মাথায় আগুন দিয়া এইখানে বসিয়া দশছিলিম তামাক পোড়াব।" শুনিয়া কমলমণি উঠিয়া বসিয়া, মধুর-কোপে, নীলোৎপলতুল্য চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, আর দশছিলিম তামাক মানে না!

এক ছিলিমের টানের জ্বালায় আমি একটী কথা কহিতে পাই না—আবার দশছিলিম তামাক খায়—আমি আর কি ভেসে এয়েছি!" এই বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং হুঁকা হইতে ছিলিম তুলিয়া লইয়া সাগ্নিক তামাকু-ঠাকুরকে বিসর্জ্জন দিলেন।"

এইরূপে কমলমণির মানভঞ্জন করিয়া শ্রীশচন্দ্র তাঁহার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীশচন্দ্র প্রকৃত প্রেমিক ছিলেন। প্রণয় যে পণ্যদ্রব্য নহে তাহা শ্রীশচন্দ্র বুঝিতেন। প্রকৃতিগত ভালবাসা কেবল একজনকেই দিতে পারা যায় এবং একবার দিলে পুনরায় আর গ্রহণ করিতে পারা যায় না। একাধিকের প্রতি যে ভালবাসা দেওয়া যায়, তাহা স্বাভাবিক পবিত্র ভালবাসা নহে, তাহা মোহজনিত বা বাসনামূলক। প্রণয়সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্রের এইরূপ ধারণা ছিল বলিয়াই তিনি যখন কমলমণির নিকট শুনিলেন যে, নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিতেছেন, তখন তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন এবং নগেন্দ্রকে বুঝাইয়া যাহাতে এই দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে স্ত্রীর সহিত নগেন্দ্রের নিকট গিয়াছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র গোবিন্দপুরে পৌছিয়া যখন দেখিলেন যে নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছেন, তখন তিনি নগেন্দ্রের প্রতি রুষ্ট হইলেন না এবং প্রতিশোধ-পরায়ণ হইয়া ভবিষ্যতে তাঁহার সহিত কুব্যবহার করেন নাই। সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া যখন নগেন্দ্র নিজেকেই তাঁহার মৃত্যুর কারণ স্থির করিয়া ক্ষোভে ও অনুশোচনায় ম্রিয়মাণ হইয়া কলিকাতায় শ্রীশচন্দ্রের বাসায় আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার শোকক্লিষ্ট মলিন মুখ দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন, এবং স্নেহভরে হস্তধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ভাই নগেন্দ্র, তোমাকে নীরব দেখিয়া আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি মধুপুর যাও নাই?"

নগেন্দ্রের মুখে শ্রীশচন্দ্র শুনিলেন, সূর্য্যমুখীর মৃত্যু হইয়াছে। তখন তিনি সান্ত্বনার কোন কথা না বলিয়া অতি সাবধানতার সহিত সূর্য্যমুখী-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কোন্ অবস্থায় কাহার সহিত কি ভাবে কথা কহিতে হয়, তাহা বিশেষরূপ জানিতেন বলিয়াই তিনি শোকার্ত্ত নগেন্দ্রের নিকট সান্ত্বনার কথা বলেন নাই। সূর্য্যমুখীর দুঃখে বিমূঢ় হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে যখন শ্রীশচন্দ্র তাঁহার কথা বলিতে ছিলেন, তখন তিনি দেখিলেন নগেন্দ্রনাথ রোদন করিতেছেন। শোক-প্রবাহ শান্ত করিবার রোদনই একমাত্র উপায় জানিয়া তিনি নগেন্দ্রনাথকে রোদন করিবার অবসর দিলেন।

পরের হৃদয় অনুভব করিতে না পারিলে কাহারও সহিত আশানুরূপ ব্যবহার করিতে পারা যায় না। সহৃদয় শ্রীশচন্দ্র অন্যের সুখে সুখী এবং পরের দুঃখে প্রকৃত দুঃখী হইতে পারিতেন। সেই জন্যই সুখের দিনে তিনি নগেন্দ্রের প্রতি যেরূপ প্রীতি-প্রদর্শন করিতেন, আজ দুঃখের সময় সেইরূপ আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। নগেন্দ্রের শোকে আপনি কাঁদিয়া তাঁহাকে কাঁদাইলেন। কিছুকালব্যাপী অবিশ্রান্ত রোদনের পর নগেন্দ্রনাথের যন্ত্রণার অনেক উপশম হইল। তখন অবসর বুঝিয়া শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন—"ভাই, বৃথা কেন আর সে কথা ভাব? তোমার দোষ কিছুই নাই। তুমি তাঁর অমতে বা অবাধ্য হইয়া কিছুই কর নাই। যাহা আত্মদোষে ঘটে নাই, তার জন্য অনুতাপ বুদ্ধিমানে করে না।"

সমাজ এবং সামাজিকতা হিসাবে শ্রীশচন্দ্র সংসারের আদর্শ। তাঁহার মত পুরুষ ও কমলমণির মত স্ত্রী অধিক থাকিলে সংসার প্রকৃত সুখের স্থান হইতে পারিত।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অতিলোভ ও অবিবেচনার বিষময় ফল

নগেন্দ্রনাথের জ্ঞাতিপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তখনও তাঁহাদের বেশ স্বচ্ছল অবস্থা ছিল। যখন দেবেন্দ্রের পিতা জীবিত, তখন তিনি মনোযোগের সহিত লেখা-পড়া করিতেছিলেন। পুত্রকে সুশিক্ষা দিয়া অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা না করিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি আর এক উপায় অবলম্বন করিলেন। ধনাকাঙ্ক্ষা-বশতঃ ও লুপ্ত-ধন-গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা মানসে অন্য কোনরূপ বিচার না করিয়া কেবল ধনাগমের আশায় দেবেন্দ্রের পিতা একজন ধনাঢ্য জমিদারের একমাত্র সন্তান হৈমবতীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন।

সংসারমধ্যে যাহা নিত্যবস্তু, যাহা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, যাহার উপর সংসারের সকল সুখ-দুঃখ নির্ভর করে এবং যাহা হইতে সংসারের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়—সেই কন্যার সম্যক্ বিচার না করিয়া বধূরূপে গৃহে আনায় কত সুখের সংসারে অনন্ত দুঃখের সৃষ্টি হইতেছে। এই অবিবেচনার জন্য কত সুশীল সুন্দর যুবক পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে এবং কত স্ত্রী চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া পাপের পথে অগ্রসর হইতেছে। এই অবিবেচনার ফলে কত ধর্ম্মভীরু সংযমী যুবক সংসারে বিতৃষ্ণ হইয়া কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে সংসার করিতেছে এবং কত স্ত্রী অদৃষ্টকে অভিসম্পাত করিতে করিতে সংসারবাসিনী হইয়া আছে। এই নিত্যঘটনা ঘরে ঘরে প্রত্যক্ষ করিয়াও চিত্তের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ অনেকেই বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিবার সময় বিচার-শূন্য হইয়া কার্য্য করে। এই উদাসীনতার জন্যই দেবেন্দ্রের পিতা এক "কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী ও আত্মপরায়ণা" বালিকার সহিত রূপবান্ ও গুণবান্ পুত্রের বিবাহ দিলেন।

যাহার বিবাহ দেওয়া যায়, পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচনের সময় অধিকাংশ স্থলেই তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য রাখা হয় না। বর বা কন্যার অভিভাবকেরা অনুসন্ধান করিয়া আপন আপন প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষানুরূপ পাত্রী বা পাত্র স্থির করেন। অথচ যাহারা বিবাহ করিবে, যাহারা অচ্ছেদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একত্রে বাস করিবে, তাহাদের প্রকৃতি, রুচি ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে কোন বিচার করা হয় না। আপনার সাধ মিটিবার সম্ভাবনা আছে দেখিলেই যে কোন স্থলে অভিভাবক পুত্র বা কন্যার বিবাহ দিয়া নিজের কর্ত্তব্যের অবসান হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। এইরূপে অনেক দম্পতী-জীবনেই ভবিষ্যৎ দুঃখের সূচনা করিয়া দিয়া অবশেষে অভিভাবকেরা অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। দুইটী মানবজীবনকে বিবিধ দুঃখে ও সময়ে সময়ে মহাপাপে নিমগ্ন করিয়া অভিভাবকেরা বিশেষ কোন দায়িত্ব বা দোষ স্বীকার করেন না, অথচ তাঁহাদেরই অবিবেচনার জন্য অনেক স্ত্রী-পুরুষকে সারাজীবন-ব্যাপী দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং কখনও কখনও পাপের পথে অগ্রসর হইতে হয়।

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বশতঃ মানুষ আত্মপরায়ণ। নিজের প্রাণ, নিজের শরীর, নিজের জিনিষের প্রতি মানুষের যেরূপ ভালবাসা হয়, অন্য কোন জিনিষের প্রতি ততটা হয় না। সেইজন্য মানুষ নিজের কার্য্যে যত নিবিষ্টচিত্ত হয়, আপনার সুখ ও সুবিধা সম্বন্ধে যত চিন্তা করে, পরম আত্মীয় স্ত্রী, পুত্র, কন্যার জন্যও ততটা করিতে পারে না। স্বেচ্ছাকৃত হউক বা অজ্ঞতাবশতঃ হউক, এই আত্মপরায়ণতার জন্য সংসারে অনেক দুঃখ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পিতা যখন পুত্রের বিবাহের জন্য পাত্রীর অনুসন্ধান করেন, তখন সাধারণতঃ তিনি তাঁহার যৌবনকালের অনেক কথা ভুলিয়া যান। যাহা

মনে থাকে এবং চেষ্টা করিলে যে সকল কথা মনে আনিতে পারেন, তাহা স্মরণ করিবার কোন আবশ্যকতা বোধ করেন না। বয়ো-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনে যে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং যে যে ভাব জাগ্রত হইত, তাহা যে পুত্রের জীবনেও ঘটিতে পারে, এ ধারণা অনেকের থাকে না। আকাঙ্ক্ষা, ভোগ-প্রবৃত্তি প্রভৃতি জীবনের মূলতত্ত্বগুলি যে সকল মানবের মধ্যে প্রায় সমানভাবে বর্ত্তমান থাকে, এ জ্ঞান অনেকেরই থাকে না এবং থাকিলেও কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যৌবনে কি কি আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, কোন্ আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই বলিয়া তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন, ভোগ-প্রবৃত্তির পথে কোন্ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন—এ সকল বিচার করিয়া পিতা যদি পুত্রের জীবনে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে সংসার কত সুখের হইত! এইরূপে সুখের পথ, শান্তির পথ প্রশস্ত হইলে জীবন কখনও দুর্ব্বহ ভারাপন্ন বলিয়া বোধ হইত না।

ভোগের পথ প্রশস্ত করিলে ভোগের নিবৃত্তি হয় না। আকাঙ্ক্ষা যত চরিতার্থ হইবে, ততই আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি হইবে। অথচ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করিলে তাহা বিনষ্ট করিতে পারা যায় না। সুতরাং কোনরূপ ভোগ-বিলাসের মধ্যে যাইতে না দিয়া যদি কোন যুবককে অতি সতর্কতার সহিত রক্ষা করা যায়, তাহা হইলেই যে তাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের নিশ্চয়তা করা হইল, ইহা বলা যায় না। বরং আকাঙ্ক্ষা-পূরণের সুযোগ দিয়া যদি ভোগ-প্রবৃত্তি দমন করিবার বাসনা তাহার হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই তাহাকে প্রলোভনের মধ্যে সুরক্ষিত করিতে পারা যায়। এই সংযম-শিক্ষা হইতেই মানবের ভাবী মঙ্গলের সূচনা হয় এবং ইহাই কেবল মানব-প্রকৃতির দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা রোধ করিতে পারে।

দেবেন্দ্রের পিতা পাঠ্যাবস্থায় পুত্রের বিবাহ দিলেন এবং পুত্র যৌবনাবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বিবাহের পর দেবেন্দ্রের স্ত্রী প্রৌঢ়া হয় নাই বলিয়া তাঁহার পিতা এ বিবাহের ফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই; নতুবা স্বীয় অবিবেচনার ফল তাঁহাকেও কিছু উপভোগ করিতে হইত।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন দেবেন্দ্রের চিত্ত-পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল, তখন সাধারণের মত তিনি স্ত্রীর নিকট সকল বাসনা পরিপূরণের আশা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর রূপ যেমনই হউক না কেন, তাহাতেই অনুরক্ত থাকিয়া তিনি বাসনা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু স্ত্রীর ব্যবহার দেখিয়া কিছুদিনের মধ্যেই তাহার ধারণা হইল যে এ স্ত্রীর দ্বারা তাঁহার কোন আশা পূর্ণ হইতে পারে না। তিনি বেশ বুঝিলেন যে এ স্ত্রী হইতে তাঁহার কোন সুখ হইবে না। অথচ স্ত্রীর প্রণয়লাভের জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছিল। অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীর দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিয়াও দেবেন্দ্র তাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু একদিন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে এমন এক কদর্য্য কটুবাক্য বলিলেন যে, তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করায়, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া স্ত্রীর কেশাকর্ষণ করিয়া পদাঘাত করিলেন। স্ত্রীর নিকট লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হওয়ায় "সুধীর সত্যনিষ্ঠ" দেবেন্দ্রনাথ কিছুকালের মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তিত হইলেন যে, অতি নীচভাবে স্ত্রীকে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পাপে অনুরাগ

বড় ঘরে দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তাঁহার সকল আবদার, সকল সাধ পূর্ণ হইত। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা সংযত করিবার অবসর কখনও তাঁহার হয় নাই। ভোগ ও বিলাসের মধ্যে বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহার চিত্ত সংযম-শিক্ষার অনুকূলভাবে গঠিত হয় নাই। চিত্ত সংযত করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে, এরূপ শিক্ষাও তাঁহার কখনও হয় নাই।

যখন দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, গৃহে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবার কোন উপায় নাই, তখন শরীর-ধর্ম্ম-প্রভাবে বিচলিত হইয়া তিনি যথেচ্ছ বাসনা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিলেন। লোকনিন্দা ও লজ্জা-ভয় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য এবং স্ত্রীর চিন্তা পর্য্যন্ত চিত্ত হইতে উন্মূলিত করিবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া, দেবেন্দ্রনাথ স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতা গমন করিলেন।

কলিকাতা মহানগরী; কর্ম্মসূত্রে বহুলোকের তথায় সমাগম হয় এবং কর্ম্মের অবসানে অনেকেই স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যায়। কেহ কাহাকেও জানে না এবং কেহ কাহারও খবর লইতে চাহে না। এই নির্লিপ্ততার সুযোগে দেবেন্দ্রনাথ অতৃপ্ত বাসনার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

নীচকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও তখন দেবেন্দ্রের চিত্ত নীচ হয় নাই। সেইজন্য নিজের চিত্তবিকার ও কুকার্য্য আলোচনা করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে দুঃখিত হইতেন। কলিকাতার অবিরাম জনপ্রবাহ ও বহু দ্রষ্টব্য পদার্থ তাঁহাকে অনুশোচনার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। তখন চিত্তের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তিনি মদ্যপান আরম্ভ করিলেন।

মানব-প্রকৃতির ধর্ম্ম এই যে, যে কার্য্য যত অধিক করা যায়, তাহাতেই তত আসক্তি ও অনুরাগ বাড়িতে থাকে। নূতন কার্য্যে অনুরাগ সঞ্চারিত হইলে পুরাতন ভাব, পুরাতন চিন্তা আর মনোমধ্যে উদিত হয় না। তখন সেই কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেই মানুষ আনন্দবোধ করে।

কদর্য্য কার্য্য আরম্ভ করিবার পর মধ্যে মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হইতেন। কিন্তু কিছুকাল গত হইলে পাপকার্য্য এবং পাপ-চিন্তাই তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন করিতে লাগিল। তখন তিনি পাপ-কার্য্যের অনুকূল সকল গুণ অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। অতি যত্নে দেবেন্দ্রনাথ বাবুগিরি, গান, বাজনা শিক্ষা করিলেন।

পাপজীবনের আনুষঙ্গিক সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া দেবেন্দ্রবাবু দেশে ফিরিলেন। যে দেবেন্দ্রনাথ আনন্দোপভোগের জন্য স্ত্রীর নিকট গিয়া লাঞ্ছিত হইয়া দেশত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ সেই পুরুষ স্ত্রীর উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্ত্রীর প্রেম, সহানুভূতি ও সাহচর্য্য ভিন্নও যে তিনি প্রসন্নচিত্তে জীবন যাপন করিতে পারেন, ইহা দেখাইবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ উপবন-গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বাধীন পুরুষ স্বাধীনভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই তিনি এক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেখানে উপাসনা হইত, ধর্ম্ম ও স্বদেশ-হিতৈষিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ হইত, সমাজসংস্কার ও কুসংস্কার বর্জ্জন-সম্বন্ধে আন্দোলন হইত। সূর্য্যমুখীর আশ্রিত ভ্রাতা তারাচরণ স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রবন্ধ সভামধ্যে পাঠ করিতেন। তাঁহার চিত্তের প্রসার দেখিয়া সভ্যগণ তাঁহাকে কুসংস্কারশূন্য উদারচেতা বলিয়া প্রশংসা করিতেন। অচিরেই তারাচরণ দেবেন্দ্রবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেন। অনেক বিষয়েই দেবেন্দ্রবাবু ও তারাচরণের একমত—দুজনেই বলিতেন, "মেয়েদের বাহির কর।"

তারাচরণ যখন স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন, তখন তিনি অবিবাহিত। স্বগৃহে একমাত্র তিনি বাস করিতেন বলিয়া এ বিষয় উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন—কোনরূপ আদর্শ স্থাপন করিতে পারিতেন না। সর্ব্বদাই মুখে বলিতেন, "কখনও যদি আমার সময় হয়, তবে এ বিষয়ে প্রথম রিফর্‌ম্ করার দৃষ্টান্ত দেখাইব। আমার বিবাহ হইলে, আমার স্ত্রীকে সকলের সম্মুখে বাহির করিব।"

দেশের অনেক যুবকের সাহচর্য্য লাভ করিয়া ও তাহাদের সহায়তা পাইয়া দেবেন্দ্রবাবু অপ্রতিহতভাবে স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে নানাবিধ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। সংযমপ্রভাবে যাহার চিত্ত কখনও কোন প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, সে লোভে পতিত হইয়া অন্যায় কার্য্য করিলে অচিরেই আত্মরক্ষা করিতে পারে। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল নষ্টচরিত্র ব্যক্তি একবার কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সফলকাম হইলে, সাহসভরে পাপ হইতে পাপান্তরে প্রবেশ করিতে থাকে।

দেবেন্দ্রনাথের পাপ-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং নির্ভয়ে পাপ-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রলোভনের আকর্ষণ

তারাচরণের সহিত কুন্দনন্দিনীর বিবাহ হইল। কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি বন্ধুদিগের মধ্যে প্রচারিত হইল। তখন কুন্দনন্দিনীর সহিত বন্ধুদিগের আলাপ করাইয়া দিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ তারাচরণকে অনুরোধ করিলেন। তারাচরণ মুখে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু সূর্য্যমুখীর ভয়ে সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। সৌন্দর্য্যলোলুপ দেবেন্দ্রনাথ ছাড়িবার পাত্র নহেন। কুন্দনন্দিনীর রূপরাশি দেখিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ সবান্ধবে একদিন তারাচরণের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং কুন্দকে দেখিয়া মুগ্ধান্তঃকরণে প্রত্যাগমন করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে কুন্দনন্দিনীর রূপ অঙ্কিত হইয়া রহিল। সে রূপপ্রভা ভুলিতে না পারিয়া তিনি আর একবার কুন্দকে দেখিয়া গেলেন। এই সংবাদ পাইয়া সূর্য্যমুখী তারাচরণকে এরূপ তাড়না করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি আর কখনও কুন্দকে দেবেন্দ্রের সম্মুখে বাহির করিতে পারেন নাই।

সংসারে যত ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়, লালসা ততই বৃদ্ধি পায়। তখন ভোগের সামগ্রী দেখিলেই উপভোগ করিবার অভিলাষ হয়। দেবেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সেইজন্য যখন তিনি শুনিলেন যে কুন্দ বিধবা হইয়াছে, তখন তাহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহার হইল। কিন্তু সে পথে যে অন্তরায় উপস্থিত হইল, তাহাতে কুন্দকে লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। অথচ কুন্দের প্রতি আসক্তি তাহার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেইজন্য কিছুদিন

অতীত হইতে না হইতেই মোহমুগ্ধ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তখন কুন্দ দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞাতি-শত্রু নগেন্দ্রনাথের পুরবাসিনী। নগেন্দ্রের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কুন্দকে প্রলোভিত করা, বিপজ্জনক জানিয়াও দেবেন্দ্রনাথ নিরস্ত হইতে পারিলেন না। ঘৃণিত কার্য্য করিয়া দেবেন্দ্রের চিত্ত এত নীচ হইয়াছিল যে, কোন কদর্য্য উপায় অবলম্বন করিতে তিনি একেবারে কুণ্ঠিত হইতেন না। সুতরাং একদিন বৈষ্ণবীর বেশ ধারণ করিয়া, হাতে খঞ্জনী লইয়া, তিনি নগেন্দ্রের অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পুরবাসিনীদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে গান শুনাইতে চাহিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ কুন্দকে চিনিতেন। স্ত্রীলোকেরা গান শুনিতে চাহিলে তিনি কুন্দনন্দিনীর নিকট গিয়া বসিলেন এবং তাহারই অভিলাষ অনুসারে একটী কীর্ত্তন গান করিলেন। পুরবাসিনীগণ পুনরায় অনুরোধ করিলে বৈষ্ণবী আর একটী কীর্ত্তন গাহিলেন।

গানের দ্বারা কুন্দনন্দিনীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণবীর বেশে দেবেন্দ্রনাথ তথায় আসিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৈষ্ণবী কুন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গীত গাহিয়া আমার মুখ শুকাইতেছে। আমায় একটু জল দাও।"

কুন্দ জল আনিল। চতুর দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, অন্যান্য স্ত্রীলোক হইতে দূরে যাইতে না পারিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। সুতরাং তিনি বলিলেন, "তোমাদিগের পাত্র আমি ছুঁইব না। আসিয়া আমার হাতে ঢালিয়া দাও, আমি জাতি-বৈষ্ণবী নহি।"

কুন্দকে জল ফেলিবার স্থানে লইয়া গিয়া অন্যের অশ্রুতস্বরে বৈষ্ণবী বলিলেন, "তোমার শ্বাশুড়ী এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বাড়ীতে

আছেন, তোমাকে একবার দেখ্‌বার জন্য বড়ই কাঁদিতেছেন। তুমি একবার কেন আমার সঙ্গে গিয়ে তাকে দেখা দিয়ে এসো না।"

কুন্দ অস্বীকার করিলে, বৈষ্ণবী তাহাকে উত্তেজিত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কুন্দ যখন সূর্য্যমুখীকে না বলিয়া বাড়ীর বাহির হইতে সম্মত হইল না, তখন বৈষ্ণবী বলিলেন, "তবে তুমি গিন্নীকে ভাল করিয়া বলিয়া রেখ। আমি আর একদিন আসিয়া লইয়া যাইব। কুন্দের শ্বাশুড়ীর অত্যধিক আগ্রহ ও আন্তরিক অভিলাষ দেখাইবার জন্য বৈষ্ণবী আরও বলিলেন, "কিন্তু দেখো, ভাল করিয়া ব'লো; আর একটু কাঁদা-কাটা করিও নহিলে হইবে না।"

বৈষ্ণবী যখন পুরস্কার চাহিল, তখন সূর্য্যমুখী তথায় উপস্থিত হইলেন। নির্ভীক দেবেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীকেও একটী গান শুনাইলেন এবং পুরস্কার পাইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। আজ তাঁহার উদ্দেশ্য কিছু সফল হইয়াছে বলিয়া হৃষ্টচিত্তে কুন্দনন্দিনীর প্রতি মনের আবেগ প্রকাশ করিয়া গান করিতে করিতে বাহিরে গেলেন—

"আয় রে চাঁদের কণা।
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পরতে দিব সোনা।
আতর দিব শিশি ভোরে,
গোলাপ দিব কার্ব্বা করে,
আর আপনি সেজে বাটা ভোরে,
দিব পানের দোনা—।"

নগেন্দ্রনাথের অন্তঃপুর-মধ্যে দেবেন্দ্রবাবু বৈষ্ণবীবেশে আর একদিন উপস্থিত হইলেন। সেদিন সূর্য্যমুখী পুরবাসিনীদিগের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া বৈষ্ণবী ভীত হইলেন না। সূর্য্যমুখী যে কিরূপ বুদ্ধিমতী, কর্ত্তব্যপরায়ণা ও ন্যায়নিষ্ঠা তাহা তিনি বিশেষরূপ জানিতেন।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি তথায় অগ্রসর হইয়া গান শুনাইতে প্রস্তুত হইলেন।

বৈষ্ণবী দেখিলেন যে সূর্য্যমুখী তথায় উপস্থিত থাকিলে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। সুতরাং সূর্য্যমুখীর গম্ভীর প্রকৃতির বিপরীত ভাবাপন্ন একটী গান তিনি আরম্ভ করিলেন। গান শুনিবার জন্য সূর্য্যমুখী কমলকে ডাকাইয়া পাঠাইলে, কমল কুন্দকে লইয়া গান শুনিতে আসিলেন। তখন বৈষ্ণবী গাহিতেছিলেন—

"মরি মরব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে,
নবীন মুকুল।"

এরূপ গান ভদ্র-ঘরের স্ত্রীলোকের নিকট গাওয়া অনুচিত বলিয়া কমল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবী-দিদি—তোমার মুখে ছাই পড়ুক—আর তুমি মর। আর কি গান জান না?"

পুরবাসিনীদিগকে গান শুনাইবার উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ তথায় আসেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য—কুন্দকে প্রাণ ভরিয়া দেখা ও তাহার সহিত আলাপ করা। বুদ্ধিমতী বিচারশক্তি-সম্পন্না পুরবাসিনীদিগকে স্থানান্তরিত করিতে পারিলে তাঁহার অভিপ্রায় সফল হইবে মনে করিয়া কমলমণিকে রুষ্ট করিবার জন্য বৈষ্ণবী তাঁহার প্রত্যুত্তর করিলেন। ভিক্ষার্থী হইয়া আসিয়া গৃহিণী বা তৎস্থানীয়ার সঙ্গত বাক্যের প্রত্যুত্তর অসঙ্গত জানিয়াও কমলমণিকে লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণবী বলিলেন, "কেন?"

কমল অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। তিনি তীব্র-বচনে বলিলেন—"কেন? একটা বাবলার ডাল আন্‌ত রে, কাঁটা ফোটা কত সুখ মাগীকে দেখিয়ে দিই।"

কমল স্বাভাবিক অবস্থায় তথায় আসিয়াছিলেন কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। অতএব বিচার করিয়া অতি সতর্কতার সহিত তিনি কার্য্য করিতেছিলেন। দেবেন্দ্র বেশ বুঝিলেন যে, যদি কমলকে আর একবার রাগাইতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি সে স্থান ত্যাগ করিবেন এবং তাঁহার সহিত অন্য কেহ কেহ চলিয়া যাইতেও পারেন। কুন্দনন্দিনী সরলা, সে গানের মর্ম্ম কিছুই বুঝে না, অথচ গান শুনিতে ভালবাসে। সুতরাং সে আপনা হইতে সে স্থান ত্যাগ করিবে না। এইরূপ আশা করিয়া দেবেন্দ্র স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিলেন।

যখন সূর্য্যমুখী বৈষ্ণবীকে গৃহস্থ বাড়ীর উপযুক্ত গান করিতে বলিলেন, তখন সময় বুঝিয়া বৈষ্ণবী এমন একটি গান গাহিলেন যে, কমল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলেন। সূর্য্যমুখী ও অন্যান্য অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়া কমলের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেলেন। যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারাও অল্প পরে উঠিয়া গেলেন। কেবল কুন্দ তথায় বসিয়া রহিল। সে গান শুনিবার জন্য সেখানে রহিল না। নিজের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ও প্রকৃতি-প্রাবল্য চিন্তা করিতে করিতে এতক্ষণ কুন্দনন্দিনী বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া তথায় বসিয়াছিল এবং তখনও রহিল।

দেবেন্দ্রনাথ কুন্দকে প্রলোভিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার নিকটে বসিয়া আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্ত্রীলোকের সহিত নিভৃতে বসিয়া গল্প করিতে দেখিলে যদি কাহারও মনে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে নিজের যে কি শোচনীয় অবস্থা হইবে এবং এই অনাথা স্ত্রীলোকের যে কত দুর্গতি হইবে, তাহা প্রলুব্ধ দেবেন্দ্র বিচার করিলেন না। লোভ তখন তাঁহাকে এরূপ বিমূঢ় করিয়াছিল যে, ভিক্ষার্থী বৈষ্ণবী অন্তঃপুর হইতে চলিয়া গেল কি না ইহা দেখিবার জন্য গৃহস্থ সতর্ক থাকিতে পারে—এ সন্দেহ তাঁহার মনোমধ্যে একবারও উত্থিত হইল না।

পাপে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি এরূপ মনুষ্যত্বশূন্য হইয়াছিলেন যে, কুন্দনন্দিনীর শুষ্কমুখ ও দুঃখভারাক্রান্ত চিত্ত দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে সহানুভূতির কণা-মাত্রও উদিত হইল না; কিংবা তাঁহার পাপ-প্রস্তাবে সেই সাধ্বী স্ত্রী হৃদয়ে কিরূপ ব্যথা পাইবে, তাহার ধারণা পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না।

পাপের পথে অগ্রসর হইলে, মানুষের চিত্ত হইতে প্রণয়প্রবৃত্তি একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়। প্রেমিক সাধারণতঃ প্রেম-প্রতিদান আশা করে, কিন্তু কামুক প্রতিদানের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল কপট প্রণয়-বচনের দ্বারা পরনারীর চিত্ত আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ মনোভাব থাকার জন্যই প্রণয়িনীর প্রেমাভিলাষ, আত্মনির্ভরতা ও উদারতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ অনুভব করিবার ক্ষমতা কামুকে থাকে না এবং সাধ্বী স্ত্রীর চিত্ত যে কিরূপ একাগ্র ও একচিন্তা-নিবিষ্ট থাকে, কামুক তাহার ধারণা পর্য্যন্ত করিতে পারে না। সেইজন্য পাপপ্রবৃত্তিসম্পন্ন কামুক পুরুষ পতিব্রতা-নারীকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে অথচ সর্ব্বত্রই শতবার প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া আসে।

দেবেন্দ্র কুন্দের নিকট বসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন, কিন্তু কুন্দ কোন উত্তর দিল না; এমন কি, সে যে বৈষ্ণবীর কথা শুনিতেছিল, এরূপ কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ নিরাশ না হইয়া বা অপমান বোধ না করিয়া, একমনে স্বীয় বক্তব্য বলিতেছিলেন। বৈষ্ণবী তখন আপন কথায় এরূপ নিবিষ্ট ছিলেন যে, সূর্য্যমুখী যে গৃহান্তর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। যখন তিনি নগেন্দ্রের অন্তঃপুর ত্যাগ করিলেন, তখন ভাবী সুখের আশায় তাঁহার চিত্ত এরূপ আচ্ছন্ন ছিল এবং সেদিনকার যাত্রা সফল হইয়াছে বলিয়া তিনি এরূপ উন্মত্ত ছিলেন যে, দাসী হীরা তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, এ বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পাপ-প্রবৃত্তি-উৎপাদনে আনন্দ

পুরুষ যতদিন এক নারীর প্রতি অনুরক্ত থাকে—সে নারী ধর্ম্মপত্নীই হউক বা নাই হউক—ততদিন তাহার চরিত্র মহৎ-দোষাক্রান্ত বলা যায় না। কিন্তু যদি কেহ একের প্রতি অনুরক্ত না থাকিয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রী অবলম্বন করে, তাহা হইলেই তাহাকে অতি হীন-চরিত্র বলিতে হইবে। এরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইলে সমাজের অত্যন্ত অনিষ্টসাধন করা হয় এবং সে পাপের ফল ইহ-জীবনে ইহ-জগতেই ভোগ করিতে হয়।

মানবচিত্তে ভোগাভিলাষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইলেও তাহাকে দমন করিয়া রাখা যায়। কিন্তু দমনের চেষ্টা না করিলে তাহা ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে। এক রিপু প্রবল হইলেও যদি অন্য সকল রিপু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং চিত্তের অন্যান্য সদ্‌গুণ বিনষ্ট না হয়, তাহা হইলে সে চিত্তের মহত্ত্ব তখনও অক্ষুন্ন থাকে। কিন্তু যদি কাহারও চিত্তে একাধিক রিপুর প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিংবা এক প্রবল রিপুর সঙ্গে অন্য সকল সদ্‌গুণের বিলোপ দেখা যায়, তাঁহা হইলেই তাহাকে হীনচরিত্র বলিতে হইবে। কামোন্মত্ত পুরুষ যদি এক প্রণয়িণীতে অনুরক্ত থাকিয়া বাসনা চরিতার্থ না করে বা একের প্রতি অনুরাগ দেখাইয়া পরে তাহাতে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া অন্যাসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে হৃদয়হীন পিশাচ বলিতে হইবে।

দেবেন্দ্রনাথ এইরূপ পৈশাচিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যেদিন দেবেন্দ্রনাথ নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে বসিয়া কুন্দনন্দিনীর সহিত আলাপ করিয়া আসিলেন, সেইদিন সন্ধ্যার সময় দত্ত-গৃহে দেবেন্দ্রবাবুর যাতায়াতের উদ্দেশ্য জানিবার জন্য দাসী হীরা দেবেন্দ্রের বাসভবন-সংলগ্ন ফুলবাগানে উপস্থিত হইল। জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া খড়খড়ি তুলিয়া হীরা সব দেখিল এবং দেবেন্দ্রের অভিপ্রায় জানিতে পারিল।

যখন হীরা বাড়ী ফিরিবার জন্য জানালার নিকট হইতে সরিয়া আসিতেছিল, তখন অসাবধানতাবশতঃ খড়খড়ি সশব্দে পড়িয়া গেল। এই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া যখন দেবেন্দ্র উঠিলেন, তখন তিনি দেখিলেন যে বাগানের মধ্য দিয়া একটী স্ত্রীলোক পলাইতেছে। দেবেন্দ্রবাবু তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বাগানমধ্যেই সেই স্ত্রীলোককে ধরিলেন এবং অন্ধকারে চিনিতে না পারায় গৃহমধ্যে লইয়া আসিলেন। সেখানে বসাইয়া দেবেন্দ্রনাথ সেই স্ত্রীলোকের হস্তে মদের গেলাস দিলেন। স্ত্রীলোক আপনা হইতেই নিজের পরিচয় দিলে, দেবেন্দ্র জানিলেন যে সে নগেন্দ্রবাবুর দাসী হীরা; কিন্তু মদের মত্ততা-বশতঃ তাহার আসিবার উদ্দেশ্যসম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

যখন মদের নেশা কাটিল, তখন তিনি বুঝিলেন যে, হীরা বৈষ্ণবীর অনুসন্ধানে আসিয়াছিল এবং অন্তরাল হইতে তাহার কথোপকথন শুনিয়া সকল উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়াছে। সে যখন সকল কথা জানিয়াছে, তখন তাহাকে আপন মনোভাব স্পষ্ট করিয়া বলিলে হয়ত সেই চতুরা দাসীর দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির উপায় হইতে পারিবে ভাবিয়া দেবেন্দ্রনাথ হীরাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

হীরা দেবেন্দ্রের কাছে আসিলে তিনি বলিলেন, "তুমি বৈষ্ণবীর অনুসন্ধানে আসিয়া আমার অভিপ্রায় জানিয়া গিয়াছ। আমি তোমার

কাছে কোন কথা লুকাইব না। তুমি আমার একটী কাজ কর, আমি পুরস্কার করিব।" প্রভূত অর্থের লোভ দেখাইয়া কুন্দকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য দেবেন্দ্র হীরাকে অনুরোধ করিলেন। হীরা এ প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া ক্রোধসহকারে সে স্থান ত্যাগ করিল।

পরে দেবেন্দ্র যখন শুনিলেন যে, কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের গৃহত্যাগ করিয়া হীরার নিকট লুকাইয়া রহিয়াছে, তখন তিনি আপন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য একদিন সন্ধ্যার সময় হীরার কুটীরে অসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেক গৃহে অনুসন্ধান করিলেন অথচ কোথাও কুন্দকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি হীরাকে কুন্দের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হীরা বলিল, "কুন্দঠাকৃরুণ বাড়ীতেই ফিরিয়া গিয়াছেন।" হীরার কথায় দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বাস হইল। আজ তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন।

দুঃখ দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে স্থায়ী হইতে পারিত না। বিবিধ উপায়ে তিনি চিত্তে প্রফুল্লতা সংস্থাপন করিতে পারিতেন। কুন্দের সংবাদ পাইয়াও দেবেন্দ্রনাথ সে গৃহ ত্যাগ করিল না। হীরার মনোভাব ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য তিনি তথায় বসিতে চাহিলেন। যখন হীরা সুন্দর শয্যা প্রস্তুত করিয়া দেবেন্দ্রকে অতি যত্নে গৃহমধ্যে বসাইলেন, তখন তাঁহার অন্তরে এক নূতনভাব জাগ্রত হইল। কুন্দনন্দিনীর প্রতি যে অনুরাগ-বশতঃ তিনি তথায় আসিয়াছিলেন, তাহা একমুহূর্ত্তে লোপ পাইল। পাশব-প্রবৃত্তির প্রাবল্যের জন্য একের প্রতি নিবিষ্ট চিত্ত অন্যের প্রতি ধাবিত হইল।

পকেট হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া হীরার সম্মুখে বসিয়াই দেবেন্দ্রনাথ পান করিলেন। মদের প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিত্ত হীরার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন হীরার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার দিব্য চক্ষু।"

স্ত্রীলোকের গৃহে বসিয়া থাকিতে দেবেন্দ্র কোন সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। প্রথমে তিনি গুন্ গুন্ করিয়া গান আরম্ভ করিলেন এবং পরে গৃহমধ্যে একখানি বেহালা দেখিতে পাইয়া তৎসাহায্যে ভাল করিয়া গান গাহিলেন।

ইতি-পূর্ব্বে হীরার গৃহে কোন পুরুষমানুষ কখনও স্বচ্ছন্দভাবে বসিয়া থাকে নাই এবং হীরাও কখনও পুরুষের সম্মুখে এরূপ স্বাধীনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পায় নাই। অথচ সে সর্ব্বত্রই স্ত্রীপুরুষের স্বাধীন মিলন দেখিয়াছে। সে মধুর মিলনের সুখোপভোগ তাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই, কিন্তু সে মিলন যে কত সুখের, তাহা হীরা বুঝিতে পারিত। সুতরাং গৃহমধ্যে দেবেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে হীরার আত্মবিস্মৃতি আসিল। হীরা তখন দেবেন্দ্রকে স্বামী মনে করিয়া তাঁহাকেই আত্ম-সমর্পণ করিল। মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় তাহার অন্তরের ভাব মুখে ব্যক্ত হইল। দেবেন্দ্রনাথ সে অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্য শ্রবণ করিলেন।

এক উদ্দেশ্য সাধিত করিতে আসিয়া দেবেন্দ্র অন্য কার্য্যসাধন করিলেন। তিনি হীরার ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, প্রেমাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ দুর্ব্বল চিত্তের পরিচয় পাইয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সংযম ও বন্ধুর প্রভাব

প্রবৃত্তি দমন করিবার কোনরূপ চেষ্টা না করায় দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি হীন হইতে হীনতর হইতে লাগিল। এখন তিনি অনেকবার মদ্য-পান করিতেন এবং অনেক সময় অধিক পরিমাণেই পান করিতেন। অত্যধিক মদ্যপান করিলে যে সকল কুফল ফলিয়া থাকে, দেবেন্দ্রের শরীরে সেগুলির একে একে প্রকাশ দেখিতে পাওয়া গেল। যকৃতের দোষ হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যহ জ্বর হইতে লাগিল।

সঙ্গদোষ বা ক্ষণিক উত্তেজনা হেতু যাহাদের চরিত্র নষ্ট হয়, অনেক সময় তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হইতে দেখা যায়। ব্যবহার-দোষের জন্য যাহাদের একদিন ইতর-শ্রেণীর মধ্যে গণনা করা হয়, সময়ে সময়ে তাহারাই দোষশূন্য হইয়া সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নানা সৎকার্য্যের দ্বারা সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে থাকে।

কু-অভ্যাস বা কু-কার্য্য ত্যাগ করিলে যাহারা সুখী হইবার আশা করিতে পারে বা সৎ হইলে অন্যের চিত্তে অসীম সুখোৎপন্ন হইবে ভাবিয়া যাহারা আত্মসুখ তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে—তাহারাই অভ্যস্তদোষ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। যখন যৌবনের প্রবল তাড়না কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়, এবং নির্ম্মল-জীবনের পবিত্রতা ও সুখের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তখন পাপ-কার্য্য হইতে বিরত হইতে অনেকের ইচ্ছা হয়। প্রথমে এরূপ ইচ্ছা হৃদয়ে জাগ্রত হইবামাত্রই প্রলোভন ও পাপের স্রোতে ভাসিয়া যায়; কিন্তু

একবার হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করিলে তাহা এরূপ দৃঢ় হয় ও এত শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে যে, পাপকেই তখন স্থানভ্রষ্ট হইতে হয়। তখন দুষ্প্রবৃত্তি ত্যাগ করা অতি সহজ হইয়া উঠে।

কাহারও প্রতি ভালবাসা থাকিলে, সেই ভালবাসা অবলম্বন করিয়া অনেকে পাপে প্রবৃত্ত হইয়াও আত্মসংবরণ করিয়া থাকে। যখন কেহ পাপকর্ম্মে মত্ত থাকে বা দুশ্চরিত্রের জন্য দুঃখভোগ করে, তখন অনেক আত্মীয় বা বন্ধু তাহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করে। যদি কাহারও আন্তরিক সহানুভূতি সেই পাপাশক্ত ব্যক্তির চিত্তে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঞ্চার করে, তাহা হইলে সেই ভালবাসার ফলে কখনও কখনও তাহার প্রকৃতি নির্ম্মল হয়। নিজের ভাল হইলে বন্ধু বা আত্মীয়ের মর্ম্মান্তিক দুঃখের অবসান হইবে ভাবিয়া অনেকে পাপকার্য্য ত্যাগ করে। যাহারা পাপে উন্মত্ত হইয়া সর্ব্বদা প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে, কেবল তাহাদের চিত্তে এই অমোঘ উপায় কোন পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে পারে না।

সংসারে আমরা অনেক আপনার লোক পাই—যাহারা সুখে সুখ এবং দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহাদের সহিত আত্মীয়তা থাকে, তাহারা সকল সময় প্রকৃত সুখে সুখী ও ব্যথায় ব্যথী হইতে পারে না। বাল্যকাল হইতে একসংসারে থাকায় এবং একসঙ্গে লালিত-পালিত হওয়ায়, একের ভার অন্যকে সহ্য করিতে হয়। আজন্ম সাহচর্য্য হইতে শৈশবে ও বাল্যে ভালবাসা জন্মায়, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ষা, দ্বেষ ও বিরক্তি উৎপন্ন হওয়ায় সে ভালবাসা কলুষিত হইয়া উঠে। তখন যদি সকলে পরস্পরের মনোমত কার্য্য করে, তাহা হইলে সহসা কোন বিরোধ বা মনোমালিন্য উপস্থিত হয় না। কিন্তু যদি কেহ আত্মীয়ের অনভিমতে বা অজ্ঞাতসারে কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া বিপন্না-

বস্থায় তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহারা প্রথমে এরূপ তিরস্কার ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে যে, সে দুঃখভারাক্রান্ত চিত্ত তাহা সহ্য করিতে পারে না। তখন সেই বিপন্ন ব্যক্তি সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে লাঞ্ছনা ও অপমান বলিয়া বোধ করে এবং ভবিষ্যতে কখনও সাহায্য প্রার্থনা করে না। এই জন্যই আত্মীয় বা ভাইয়ের উপদেশে প্রায় কাহারও চরিত্র সংশোধিত হয় না।

যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না কিংবা যে একসংসারে একসঙ্গে প্রতিপালিত হয় নাই, সেই কেবল যৌবনে প্রকৃত উপকার করিতে পারে। কোন আত্মীয়তা না থাকায় তাহার চিত্তে ঈর্ষা, দ্বেষ আসিতে পারে না। বাল্যকাল হইতে কোন ভারবহন করিতে না হওয়ায় বা তাহার কোন কার্য্যে সংশ্লিষ্ট না থাকায়, বিরক্তি আসিতে পারে না। বিশেষতঃ, এরূপ ব্যক্তি যখন অন্যের সাহায্যার্থে প্রস্তুত হয়, তখন বুদ্ধি ও শিক্ষার প্রভাবে তাহার প্রকৃতি ধীর ও গম্ভীর হইয়া উঠে। এই অবস্থায় সে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ অনুভব করিয়া স্নেহ ও ভালবাসার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারে। ইহাই প্রকৃত বন্ধুত্ব এবং এইরূপ বন্ধুই নিজের ব্যবহার ও উপদেশের দ্বারা অন্যের চিত্ত পরিবর্ত্তন করিতে পারে।

দেবেন্দ্রনাথের এইরূপ একটী বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁহার মাতুলপুত্র সুরেন্দ্র। তিনিই কেবল দেবেন্দ্রের মঙ্গলচিন্তা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতেন। সুরেন্দ্রের ইচ্ছা যে, দেবেন্দ্রনাথ সৎ হইয়া সুস্থ-শরীরে কিছুদিন বাঁচিয়া থাকেন। সেইজন্য দেবেন্দ্রের অসুস্থ শরীর ও যকৃতের দোষের কথার উল্লেখ করিয়া, তিনি দেবেন্দ্রকে মদ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "অনেকে ত্যাগ করিয়াছে—তুমিও ত্যাগ করিবে না কেন?"

দেবেন্দ্র উত্তর করিলেন, "আমি কি সুখের জন্য ত্যাগ করিব?

যাহারা ত্যাগ করে, তাহাদের অন্য সুখ আছে—সেই ভরসায় ত্যাগ করে। আমার আর কোন সুখই নাই।"

অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য দেবেন্দ্র পাপের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সংযমাভাবে উত্তেজিত রিপুর প্রবল তাড়নায় দেবেন্দ্রনাথ পাপকর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন। কোনও অন্যায় কার্য্য করিয়া তিনি ক্ষণকালের জন্য সন্তোষলাভ করিতেন, কিন্তু স্থায়ী-সুখ ভোগ করিতে পারিতেন না। ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ করিলে যে শান্তি পাওয়া যায়, অধর্ম্মের পথে সেরূপ একেবারেই পাওয়া যায় না। রিপুর তাড়নায় কোন অন্যায় করিলে, যখন চিত্ত পুনরায় স্থির হয়, তখন তীব্র অনুশোচনা ও পশ্চাত্তাপ ভোগ করিতে হয়। সেই যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য পাপী মদের আশ্রয় লইয়া থাকে। যদি ইহারা কোনদিন প্রকৃত সুখের আশায় পাপকার্য্য ত্যাগ করে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে মদ খাওয়াও ছাড়িতে পারে।

ভবিষ্যৎ সুখলাভের কোনও উপায় যাহাদের না থাকে, অথচ বাঁচিবার সাধ থাকে, তাহারা শরীর ভগ্ন হইলে প্রবৃত্তি সংযত করিবার চেষ্টা করে। পাপকার্য্যে রত থাকায় অত্যাচার ও অনাচার-বশতঃ শরীরে যখন রোগের সঞ্চার হয়, তখন প্রাণরক্ষার জন্য কেহ কেহ অত্যাচার বন্ধ করে। কিন্তু যাহার বাঁচিবার কোন সাধ নাই এবং জীবনধারণ কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়, সে সেই অত্যাচারকেই আত্মহত্যার উপায় মনে করিয়া তাহাতেই লিপ্ত থাকে। এইজন্যই যখন সুরেন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে মদ ছাড়িবার জন্য বলিলেন, "তবু বাঁচিবার আশায়, প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় ত্যাগ কর," তখন দেবেন্দ্র বলিলেন, "যাহাদের বাঁচিয়া সুখ, তাহারা বাঁচিবার আশায় মদ ছাড়ুক। আমার বাঁচিয়া কি লাভ?"

স্ত্রীর দুর্ব্ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ

পাপকার্য্যে রত হইয়াছিলেন। স্ত্রীর সাহচর্য্যলাভ করিতে যাইয়া তাঁহাকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, স্ত্রীকে তদনুরূপ কষ্ট দিবার জন্যই তিনি পৈতৃক গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পরস্ত্রীতে অনুরক্ত থাকিয়া স্ত্রীর চিত্তে নিত্য নূতন ক্লেশ উৎপাদন করিতেছিলেন। পুরুষচিত্তের কঠোরতাবশতঃ প্রতিশোধ পূর্ণ করিবার মানসে স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় যাহাতে তাঁহার দুঃখ নিরবচ্ছিন্ন হয়, সেইজন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু কখনও কখনও এরূপ ইচ্ছা হইত যে, সেই স্ত্রীর মৃত্যু হইলে আবার চিত্ত সংযত করিয়া দুর্ব্বাসনা ত্যাগ করিবেন এবং সৎ হইয়া অবশিষ্ট জীবনযাপন করিবেন।

দেবেন্দ্র, সুরেন্দ্রের সাধু-চরিত্র, উদার প্রকৃতি ও পরোপকার প্রবৃত্তির জন্য তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার প্রতি দেবেন্দ্রের যথেষ্ট ভালবাসা ছিল। সে ভালবাসা তখন তাঁহাকে স্থির-সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিত না, কিন্তু দেবেন্দ্র আশা করিতেন যে, হয়;ত একদিন সুরেন্দ্রের ভালবাসায় তিনি অভিভূত হইবেন। সেই জন্যই যখন সুরেন্দ্র সস্নেহ-বচনে বলিলেন, "তবে আমাদের অনুরোধে ত্যাগ কর," তখন দেবেন্দ্র-নাথের চক্ষে জল আসিল। তিনি বলিলেন, "আমাকে যে সৎপথে যাইতে অনুরোধ করে, তুমি ভিন্ন এমন আর কেহ নাই। যদি কখনও আমি ত্যাগ করি, সে তোমারই অনুরোধে করিব।"

সুরেন্দ্রের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের ভালবাসা ছিল, কিন্তু ভোগ-প্রবৃত্তি তাঁহার চিত্ত উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া, সে ভালবাসা কিছুকালের জন্য কার্য্যকরী হইল না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পাপের লাঞ্ছনা।

মানব-প্রকৃতির অন্য একটী বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক মনুষ্য নিজের সম্বন্ধে যতটা অনুসন্ধান ও আলোচনা করে, অন্যের সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা অধিক অনুসন্ধান করিয়া আলোচনা করে। অন্যে কি করে, লোকের সহিত তাহার ব্যবহার কিরূপ, কাহার চরিত্র কি রকম, অমুক কি উদ্দেশ্য লইয়া জীবনে কাজ করিতেছে ইত্যাদি বিষয় লইয়া মানুষ যত আলোচনা করিয়া থাকে, তাহার একাংশও যদি নিজের সম্বন্ধে করিত, তাহা হইলে ব্যক্তিগত জীবন অনেক উন্নত হইত এবং জগতের সুখ বর্দ্ধিত হইয়া দুঃখ সীমাবদ্ধ হইয়া আসিত।

মানব-প্রকৃতির এই বিশেষত্বের জন্য জগতের কোন ঘটনা প্রচ্ছন্ন থাকে না। অতি সতর্কতার সহিত কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা অচিরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পরচর্চ্চা-প্রবৃত্তি মানুষের চিত্তে এত প্রবল যে, মানুষ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মনোভাব পর্য্যন্ত আলোচনা করিবার চেষ্টা করে। সেইজন্য কখনও কখনও চিন্তা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই অন্যের আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়ে।

জগতে কোন কার্য্য গোপন থাকে না জানিয়াও লোকে আপন আপন কার্য্য গোপন রাখিবার চেষ্টা করে। পাপাসক্ত ব্যক্তি অন্যের দৃষ্টির পরোক্ষে থাকিয়া কার্য্য করে এবং মোহমুগ্ধ অবস্থায় মনে করে যে, এ কার্য্য সম্পূর্ণভাবে অবিদিত থাকিবে। কিন্তু পরে যখন সে শুনে যে, তাহার কার্য্য লইয়া অন্যে আলোচনা করিতেছে, তখন সে বিস্ময়াপন্ন হয়।

অন্যায় কার্য্য শুনিয়া দশের মধ্যে এরূপ আলোচনা শুনিলে প্রলুব্ধ ব্যক্তি সেই কার্য্য করিতে প্রথম প্রথম কুণ্ঠিত হয়। কিন্তু মোহ তাহাকে পুনরায় সেই কার্য্যে আসক্ত করে। তখন সে অধিকতর সাবধানতার সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। পরে যখন সে দেখে যে তাহাতেও অনুষ্ঠিত কার্য্য গোপন থাকে না, তখন লোক-লজ্জা ও সমাজভয় ত্যাগ করিয়া অন্যের সমক্ষেই পাপকার্য্যে নিযুক্ত হয়।

দেবেন্দ্রনাথ বৈষ্ণবীর বেশে সজ্জিত হইয়া মধ্যাহ্নকালে প্রচ্ছন্নভাবে নগেন্দ্রের অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, এ কার্যসম্বন্ধে কেহই কিছু জানিতে পারিবে না। যেদিন দেবেন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার জন্য মধ্যাহ্নে নগেন্দ্রের ভবনে গিয়াছিলেন, সেইদিন সন্ধ্যার সময় যখন সুরেন্দ্র সেই কার্য্যের উল্লেখ করিয়া দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার আজ তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"—তখন দেবেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার গোপন কার্য্য এই অল্প সময়ের মধ্যেই অন্যের কর্ণ-গোচর হইয়াছে জানিয়া বলিলেন, "ইহারই মধ্যে তোমার কাণে গিয়াছে!"

আত্মীয়ের এইরূপ অধঃপতন ও হীনবৃত্তি দেখিয়া সুরেন্দ্র অতি দুঃখিত-অন্তঃকরণে তথায় আসিয়াছিলেন। এ দুষ্প্রবৃত্তি ত্যাগ করিবার জন্য তিনি দেবেন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না।

কুন্দনন্দিনীর দর্শনাবধি দেবেন্দ্রের চিত্তে এরূপ রূপ-তৃষ্ণা জন্মিয়াছিল যে, তাহাকে দেখিবার বাসনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। সেই রূপসীকে দেখিতে, তাহার সহিত কথা কহিতে, গান গাহিয়া তাহার মনে আনন্দোৎপাদন করিতে দেবেন্দ্রের এত সুখ হইত যে, তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা একবারও হইত না। বৈষ্ণবীবেশে সজ্জিত হইয়া নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে যাওয়া ত্যাগ করিবার জন্য যখন সুরেন্দ্র অনুরোধ করিলেন,

তখন দেবেন্দ্রনাথ তাহা অসম্ভব জানাইয়া বলিলেন, “তুমি আমার একমাত্র সুহৃদ্। আমি অর্দ্ধেক বিষয় ছাড়িতে পারি, তবু তোমায় ছাড়িতে পারি না। কিন্তু তোমাকে যদি ছাড়িতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা ছাড়িতে পারিব না।”

তারাচরণের গৃহে কুন্দকে দেখা অবধি সেই অনন্ত-সৌন্দর্য্যশালিনীর রূপ-দর্শন-লালসা দেবেন্দ্রের চিত্তে ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল। সেই প্রবল বাসনায় বিচলিত হইয়া তিনি ছদ্মবেশে জ্ঞাতিশত্রু নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে যাইয়া কুন্দকে দর্শন করিয়া আসিলেন।

যাহাকে দেখিতে ভাল লাগে, সকল চিন্তা ছাড়িয়া যাহার কথা মনোমধ্যে আলোচনা করিতে সুখবোধ হয়, যাহাকে সুখী দেখিলে মনে অপার আনন্দ হয়, এবং যাহাকে সুখী করিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও ক্ষতিবোধ হয় না—তাহাকে আপনার করিতে পারিলে কত আনন্দ হয়! যাহার অধরের হাসি একবার দেখিয়া কাল্পনিক-নেত্রে পুনঃ পুনঃ দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, যাহার স্মৃতি অবলম্বন করিয়া আদর ও যত্ন করিতে চিত্ত পুলকিত হয়, অঙ্কশায়িনী করিয়া তাহার হাসি দেখিতে ও স্নেহ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? যাহার সহিত একবার কথা কহিবার জন্য বিপদ ও লাঞ্ছনা-ভয় ত্যাগ করিতে পারা যায়, হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই প্রেমপ্রতিদান ও সোহাগ-বাণী শুনিবার জন্য প্রাণের ভয় সানন্দে হৃদয় হইতে দূর করিতে পারা যায়।

কুন্দকে আপনার আয়ত্ব করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে হীরাকে পুরস্কারের লোভ দেখাইলেন। কুন্দের চিত্তে দেবেন্দ্রের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত করিয়া দিবার জন্য বহু অর্থের প্রলোভন দেখাইলেন। পরে যখন শুনিলেন যে, কুন্দ গৃহত্যাগ করিয়া হীরার কুটীরে রহিয়াছে, তখন কুন্দকে লাভ করিবার জন্য তাহার অনু-

সন্ধানে আপনি হীরার গৃহে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় কুন্দের সাক্ষাৎ না পাওয়ায় তিনি নগেন্দ্রের বাড়ী যাইয়া কুন্দনন্দিনীকে পাইবার চেষ্টা করিলেন।

নগেন্দ্রনাথের সহিত কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিয়া সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিলে, দত্তগৃহে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানের জন্য নগেন্দ্র দেশত্যাগ করিলে, অবসর বুঝিয়া দেবেন্দ্রনাথ একদিন কুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন।

এই দিন কোনরূপ ছদ্মবেশ ধারণ না করিয়া দেবেন্দ্রবাবু আপন পরিচ্ছদে পরিহিত হইয়া সন্ধ্যার পর নগেন্দ্রের ভবন-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। লতাচ্ছাদিত প্রস্তর-মণ্ডিত মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইয়া তথায় শয়ানা এক স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। চন্দ্রকিরণে সে স্থান উদ্ভাসিত হইয়াছিল; তাহাতে দেবেন্দ্র চিনিতে পারিলেন, সে হীরা।

হীরার প্রতি কপট প্রণয় দেখাইয়া তথায় কুন্দনন্দিনীকে আনিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে হীরা মৌখিক সম্মতি জানাইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ইতি-পূর্ব্বেই হীরার চিত্তে দেবেন্দ্রের প্রতি প্রণয় সঞ্চারিত হইয়াছিল। প্রভুগৃহে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তাহার চিত্ত প্রেমপ্রভাবে ব্যথিত হইত। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে না বলিয়া সময়ে সময়ে তাহার হৃদয় দুঃখে অভিভূত হইত। সেইজন্য কুন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্র তথায় আসিয়াছেন জানিয়া হীরা অত্যন্ত দুঃখিতা হইল এবং অন্তরালে বসিয়া কিয়ৎকাল অশ্রুবর্ষণ করিল। পরে আত্মসংবরণ করিয়া দেবেন্দ্রের কপট প্রণয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্বারবানদিগের নিকট গিয়া বলিল, "তোমরা শীঘ্র আইস, ফুল-বাগানে চোর আসিয়াছে।" দ্বারবানেরা তৎক্ষণাৎ ফুলবাগানের দিকে ছুটিল।

দেবেন্দ্রবাবু কুন্দনন্দিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথের দিকে চাহিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই পথে জুতার শব্দ শুনিয়া ও লাঠি হাতে করিয়া দ্বারবানদিগকে আসিতে দেখিয়া, তিনি লতামণ্ডপ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। প্রস্থানকালে দ্বারবানদিগের হস্তে তিনি ঈষৎ পুরস্কৃত হইলেন। কুপ্রবৃত্তির জন্য দেবীপুরের জমিদার দেবেন্দ্রবাবু এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়া সেদিন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

পাপের প্রায়শ্চিত্ত

হীন-চরিত্র ব্যক্তি যে কিরূপ কুটিল হইতে পারে, তাহা অতি বিচক্ষণ পুরুষও ধারণা করিতে পারে না। পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য সে যেরূপ নীচ ও দুঃসাহসিক উপায় অবলম্বন করিতে পারে, প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া শোধ লইবার জন্য সে সেইরূপ নির্ম্মম হৃদয়হীন কার্য্য করিয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তি কখন কি উদ্দেশ্যে কার্য্য করে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না বলিয়াই বিজ্ঞ ব্যক্তি অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন। যাহারা এ নীতিকথা অগ্রাহ্য করিয়া অসতের সহিত আহার-ব্যবহার করে, তাহাদের প্রায়ই বিপদে পড়িতে হয়।

দেবেন্দ্র এইরূপ অবমানিত হইয়া হীরাকে নিজের লাঞ্ছনার একমাত্র কারণ স্থির করিলেন। হীরার এই অন্যায়াচরণের প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া, তিনি একদিন হীরাকে আপন ভবনে ডাকাইলেন।

দেবেন্দ্রকে অপমানিত করা অবধি হীরা একটু দুঃখিত এবং ভীত হইয়াছিল, সুতরাং আহূত হইবামাত্র সে দেবেন্দ্রের নিকট যাইল না।

কিন্তু তাঁহার প্রতি ভালবাসায় হীরা বিচলিত হইল। দুই একদিন বিলম্ব করিয়া দেবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হীরা তাঁহার বিলাস-মন্দিরে উপস্থিত হইল।

দেবেন্দ্র হীরার প্রতি কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া সাদরে আহ্বান করিলেন এবং স্বীয় আন্তরিক অভিলাষ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কপট প্রণয়ালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রেমবৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ হীরার প্রতি ভালবাসা দেখাইয়া এরূপ সহৃদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, প্রণয়াভিলাষিণী হীরা তাঁহার আদর ও সোহাগে অতি শীঘ্রই মুগ্ধ হইয়া পড়িল। তখন দেবেন্দ্র হীরাকে মদ্যপান করাইলেন। ঈষৎ মত্ততা জন্মিলে, দেবেন্দ্র হীরাকে গান করিতে বলিলেন। তখন হীরা উচ্চকণ্ঠে প্রেমভিক্ষাপূর্ণ একটি প্রণয়-সঙ্গীত গাহিল। যখন হীরা সম্পূর্ণ বুদ্ধিভ্রষ্ট হইল, তখন দেবেন্দ্র তাহার প্রতি চিরপ্রেম প্রতিজ্ঞা করিলেন। হীরাও তদনুরূপ প্রতিদান দিতে কৃপণতা করিল না। তখন দুইজনে "চিরপাপরূপ চিরপ্রেমে" আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সকল বাসনা পূর্ণ করিল।

হীরার সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। বহু আয়াসে রক্ষিত ধর্ম্ম একদিনের শিথিলতায় নষ্ট হইল। এইরূপে হীরার প্রতি বৈরনির্য্যাতন সম্পন্ন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ নিজের পুরুষত্ব প্রদর্শন করিলেন।

কিছুদিন পরে দেবেন্দ্র হীরার প্রতি প্রেম-প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি হীরাকে একদিনের জন্যও ভালবাসেন নাই; সুতরাং সহসা হীরাকে ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর হইল না। কিন্তু হীরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছিল—স্ত্রী স্বামীকে যেরূপ ভালবাসে সেইরূপ ভালবাসিয়াছিল। এইজন্য যখন দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে বিদায় দিতেছিলেন, তখন হীরা তাঁহার পদানত হইয়া অতি কাতরভাবে দয়া ভিক্ষা করিয়া বলিয়াছিল, "দাসীরে পরিত্যাগ করিও না।" তখন দেবেন্দ্রনাথ তাহার

উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া স্পষ্টভাবে বলিলেন, "আমি কেবল কুন্দনন্দিনীর লোভে তোমাকে এতদূর সম্মানিত করিয়াছিলাম—যদি কুন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাতে পার, তবেই তোমার সঙ্গে আমার আলাপ থাকিবে, নচেৎ এই পর্য্যন্ত। তুমি যেমন গর্ব্বিতা, তেমনই আমি তোমাকে প্রতিফল দিলাম; এখন তুমি এই কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া গৃহে যাও।"

প্রকৃত প্রণয়ের এরূপ অবমাননা দেখিয়া, পুরুষ-চরিত্রের এরূপ কুটিলতা দেখিয়া, স্ত্রীলোকের ধর্ম্মের প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা দেখিয়া, হীরা ক্রোধান্ধ হইল। তখন সে পাপিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতি কটু তিরস্কার করিল। সে তিরস্কার অসহ্য বোধ হওয়ায়, দেবেন্দ্র হীরাকে পদাঘাত করিয়া সেই বিলাস-মন্দির হইতে বিদূরিত করিলেন। হীরার অপাত্রে অর্পিত প্রণয়ের এইরূপ পরিণতি হইল।

এইরূপে দেবেন্দ্রনাথ মহাপাপগ্রস্থ হইলেন। সংসারে যত প্রকার পাপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারই সর্ব্ব-নিকৃষ্ট। অসংযত চিত্তের দুষ্প্রবৃত্তি হইতে আরব্ধ হইয়া পরে এই মহাপাপ অনুষ্ঠিত হয়। এই মহাপাপের আদি কারণ চিত্ত হইতে সমূলে উৎপাটিত না হইলে ইহজীবনেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। অসংযত উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি মানব ইহজীবনেই তাহার কর্ম্মের ফলভোগ করিল না, এরূপ ঘটনা কোথাও দৃষ্ট হয় না।

কিছুকাল হইতেই দেবেন্দ্রের অসদাচরণের ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার জ্বর হইত কিন্তু মদ্যপান ও অত্যাচারের বিরতি না হওয়ায়, ব্যাধি উৎকট ও কদর্য্য হইয়া উঠিল। তখন দেবেন্দ্রনাথ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে হীরা দেবেন্দ্রের সহিত একবার দেখা করিতে আসিয়াছিল। হীরা তখন উন্মাদিনী। হীরা তাঁহার দুষ্কৃতি স্মরণ

করাইয়া দেবেন্দ্রনাথকে বলিল, "আশীর্ব্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।"

হীরার দর্শন দেবেন্দ্রের চিত্তে নূতন যন্ত্রণার সৃষ্টি করিল। রোগ-যাতনা অপেক্ষা এই যাতনা অধিকতর তীব্র হইল। আজীবন অনুষ্ঠিত পাপের চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইল। এই চেতনার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহারই দুর্ব্ব্যবহারের জন্য হীরাকে উন্মাদিনী হইতে হইয়াছে এবং এখন ভিক্ষা করিয়া অনাহার ও অল্পাহারে তাহাকে দিনপাত করিতে হইতেছে, তখন তাঁহার অসৎপ্রবৃত্তির জন্য দারুণ অন্তর্গ্লানি ও অনুশোচনা আরম্ভ হইল। হীরার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতে করিতে যখন "দেহি পদপল্লবমুদারং" গানটি মনে হইল, তখন দেবেন্দ্রনাথ বৃশ্চিক-দংশনবৎ জ্বালা বোধ করিলেন। যে সঙ্গীত দ্বারা হীরাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং যে সঙ্গীত কালস্বরূপ হইয়া হীরার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল—সেই সঙ্গীত জ্বালাময় হইয়া অহরহ তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন মৃত্যুশয্যা তাঁহার কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইল। সেই সঙ্গীত তাঁহার জ্বর-কালীন প্রলাপবাক্য হইল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও দেবেন্দ্র "পদপল্লবমুদারং" উচ্চারণ করিয়াছিলেন। অতি যাতনায় দেবেন্দ্রের প্রাণ-বিয়োগ হইল এবং মৃত্যুর সঙ্গে সেই পাপ-দেহ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

স্ত্রী-প্রকৃতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্ত্রীলোক ও তাহাদের শিক্ষা

জাতিগত বিশেষত্বের উপর স্ত্রীলোকের প্রকৃতি নির্ভর করে। যে জাতির যে উদ্দেশ্য সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল পুরুষ আপন আপন উদ্দেশ্য সাধিত করিবার উপযোগী করিয়া স্ত্রীদিগকে প্রস্তুত করে। পুরুষের দুই প্রকার কর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়—এক মুখ্য, অন্য গৌণ। প্রত্যেক জাতির পুরুষগণ এই দুই প্রকার কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকে। কিন্তু যে কর্ম্ম একজাতির পক্ষে মুখ্য, অন্য একজাতি হয়ত সেই কর্ম্মকে অপ্রধান বলিয়া মনে করে। সুতরাং এই দুই জাতির অন্তর্ভুক্ত পুরুষ একই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেও সম্পাদন-প্রণালী ও উদ্দেশ্যে বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতির চরম উদ্দেশ্য সাধিত করিবার জন্য স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তি গঠিত করা হয় এবং প্রধান কর্ম্মে সহায়তা করিবার জন্য তাহাদের উপর কার্য্যের ভার অর্পণ করা হয়। এইজন্য দুই জাতির পুরুষের কর্ম্ম বাহ্যতঃ একপ্রকার মনে হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের কর্ম্মে কোন সমতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে জাতি যতদিন স্বাধীন থাকে এবং অন্য জাতির সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট না হয়, ততদিন সে জাতির স্ত্রীলোকের কার্য্য সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত

থাকে। কিন্তু যখন কোন জাতি স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট হয় এবং বিজেতা জাতির সংস্রবে আসিতে থাকে, তখন হইতে পরাজিত জাতির উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীলোকের প্রকৃতি ও কার্য্য ভিন্ন হইয়া যায়। স্ত্রীলোকের প্রকৃতি ও কার্য্য একবার বিভিন্ন ভাব ধারণ করিলে আর সে জাতির জাতীয়তা থাকে না। তখন পরাজিত জাতি বিজেতার সহিত মিলিত হইয়া যায়।

স্ত্রী-প্রকৃতি ও স্ত্রীলোকের কার্য্য হইতে একটী জাতির জীবনের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে স্থির করিতে পারা যায়। যে জাতির স্ত্রীলোকের প্রকৃতি ও কার্য্য যতদিন পরিবর্ত্তিত না হইবে, ততদিন তাহার জাতীয় জীবন অব্যাহত থাকিবে। সুতরাং যদি কোন পরাধীন জাতি আপন বিশেষত্ব অক্ষুণ্ন রাখিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা করে, তাহা হইলে সে জাতির প্রত্যেক পুরুষকে যত্নশীল হইয়া স্ত্রীলোকদিগের প্রবৃত্তি ও কার্য্য অবিকৃত রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এরূপ করিলে এক জাতির পুরুষ অন্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য গ্রহণ করিলেও জাতিগত প্রকৃতি তখনও অক্ষুণ্ন থাকিবে এবং এক স্ত্রী-প্রকৃতি হইতে সে জাতি বিজেতা জাতির সহিত মিলিত না হইয়া আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবে।

বহুকালের পরাধীনতা ও বিজেতার প্রভাবে আমাদের কর্ম্ম পূর্ব্বের তুলনায় বিভিন্ন হইলেও জাতিগত প্রকৃতির এখনও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। পাশ্চাত্য জাতির সংস্রবে আমাদের অর্থাকাঙ্ক্ষা ও ভোগলিপ্সা বর্দ্ধিত হইলেও, অন্তরে এখনও শান্তির আশা করিয়া থাকি এবং সংসারের সুখ ও জীবনের শান্তিকেই প্রধান বলিয়া মনে করি। সেইজন্য আমাদের স্ত্রীলোক-দিগকে অর্থোপার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা ও কার্য্য না দিয়া সংসারের সুখ ও শান্তি বর্দ্ধিত করিবার উপযোগী করা হয় এবং সেই কার্য্যেই নিযুক্ত রাখা হয়।

স্ত্রী-শিক্ষা বহুকাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে, কিন্তু শিক্ষা-প্রণালী এখন অনেক স্থলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অধুনা আমাদের উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তন হওয়ায়, স্ত্রীশিক্ষার কিছু বিভিন্নতা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম জীবনে তাঁহাদের শিক্ষার পার্থক্য থাকিলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা এখনও চির-প্রচলিত প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিদেশীয় আদর্শের অনুকরণে যাহাদের উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং যাহারা আপন আপন উদ্দেশ্য সাধিত করিবার জন্য নূতন-প্রণালীতে স্ত্রী-শিক্ষা দিতেছে, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদেরও চির-প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিতে দেখা যায়। স্বীয় আদর্শের অনুকূলভাবে শিক্ষিতা যুবতীকে বিবাহ করিয়া এবং বিবাহের পর পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষা দিয়াও স্ত্রীকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দেওয়া হয় না এবং স্বামী আপন সুখের জন্য স্ত্রীকে গৃহ-কর্ম্মেই ব্যাপৃত রাখে। অথচ নূতন-আদর্শে গঠিত হইয়া পাশ্চাত্য রমণীর অনুকরণে শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা অবরোধ ও গৃহ-কর্ম্মকে হেয়-কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে থাকে। এইরূপ স্ত্রীলোককে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হইলে তাহারা অচিরেই বিরক্ত হইয়া পড়ে এবং শিক্ষা ও জীবনকে নিরর্থক নিষ্ফল বলিয়া মনে করে। এই অসন্তোষ হইতে সংসারে বিরোধ ও অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং দম্পতী-জীবন দুঃখপূর্ণ হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকের আদর্শের অল্পাধিক বিভিন্নতা ও স্বভাবের প্রতিকূল শিক্ষার জন্য আজকাল অনেক সংসারেই অশান্তির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের প্রকৃতির অনুকূল শিক্ষা পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সে শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে যাইতে হইত না—প্রতি-গৃহস্থের সংসারই তখন বিদ্যালয় ছিল, আদর্শ-গৃহিণীরা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন এবং আদর্শ হিন্দু-রমণীর চরিত্র ও কার্য্যাবলী-ই পাঠ্য ছিল। এ পাঠ শেষ করিয়া এবং পাঠ্য-বিষয়গুলি কার্য্যে পরিণত করিয়া নিজ শক্তি অনুসারে উচ্চ-শিক্ষা

লইতেন। জোর করিয়া এরূপ উচ্চশিক্ষা তাঁহাদের দেওয়া হইত না। আপন আপন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিবশতঃ তাঁহারা এই শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। এইরূপ শিক্ষা হইতে চিত্ত পবিত্র ও উন্নত হইত, হৃদয় প্রশান্ত ও উদার হইত, এবং স্বার্থের পরিবর্ত্তে পরার্থে কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি জন্মিত।

প্রকৃতির অনুকূল শিক্ষা প্রচলিত ছিল বলিয়াই তখন স্ত্রীলোকেরা আপন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া অন্যের সেবা ও সুখোৎপাদন করিতে আনন্দবোধ করিতেন। স্বামীর সেবা, তাঁহারঅভাব ও অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা, শ্রান্ত-স্বামীর ক্লান্তি দূর করিবার জন্য পরিচর্য্যা, তাঁহার সুখে সুখ ও দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করাকে দাসীত্ব মনে করিয়া স্ত্রী-জন্মকে ধিক্কার দিতেন না। পুত্র-কন্যার লালন-পালন ও শিক্ষাদান, আত্মীয়-স্বজনের প্রতিপালন, রুগ্ন আত্মীয়ের সেবা ও গৃহস্থালীর কর্ম্মকে সেই সাধ্বী রমণীরা জাতিগত স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়াই মনে করিতেন। সেইজন্য এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহারা আপন কৃতিত্ব ও মহত্ত্বের প্রচার না করিয়া নীরবেই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপ উদার-প্রকৃতি সম্পন্না, কর্ম্মরতা, স্বার্থলেশ-শূন্যা আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিলেই চিনিতে পারা যায় এবং মস্তক আপনা হইতেই সেই দেবীর চরণ-কমলে নত হইয়া আসে।

এইরূপ আদর্শ-নারীর সংখ্যা আমাদের দেশে দিনে দিনে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং সেই সঙ্গে সংসারের দুঃখ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। এই আদর্শ নারী দুর্ল্লভ হওয়ায়, অভাব ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ সংসার অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া উঠিতেছে, রোগ-শোক-ক্লিষ্ট পুরুষ অন্তর ও বাহিরের জ্বালায় সতত দগ্ধ হইয়া বিষণ্ণ ও মলিন-মুখে সংসার করিতেছে। যদি কোন দিন স্ত্রীলোকের আদর্শের পরিবর্ত্তন হয় এবং তাহারা প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলেই আবার সংসার সুখের হইবে এবং পুরুষের মুখে আবার সেই নির্ম্মল হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পতি-প্রাণতা

স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ অভিমানিনী হইয়া থাকে। এই অভিমানের মাত্রা যদি অত্যন্ত অধিক হয়, কিংবা আবশ্যক হইলে যদি ইহাকে সংযত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে এই অভিমানই স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রণয় থাকিলে মানাভিমান তাহাদের চিত্ত দৃঢ়তর-রূপে আবদ্ধ করে, কিন্তু প্রণয়-বন্ধন শিথিল হইলে, মানাভিমান দুইটী হৃদয় সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেয়। সেইজন্য অভিমানিনী স্ত্রীলোকের জীবনে অনেক দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যে স্ত্রী সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা অথচ অভিমানশূন্যা, সে সংসারে থাকিয়া পুরুষকে পাপের পথ হইতে রক্ষা করিয়া পুণ্যের পথে লইয়া যাইতে পারে। এইজন্য সাধ্বী পতিপ্রাণা স্ত্রীর সাহচর্য্য হইতে পুরুষের প্রকৃতির অবনতি না হইয়া উন্নতি হইতে থাকে। কর্ম্মক্ষেত্রের বিবিধ প্রলোভনে বিচলিত পুরুষ যখন কলুষিত অন্তঃকরণে স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়, তখন স্বামীর মানসিক অবস্থা বুঝিতে স্ত্রীর কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। চিত্তের বিকৃতি বুঝিতে পারিয়া স্ত্রী যদি স্বামীর চিত্ত-পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিয়া সহানুভূতিপূর্ণ অথচ দৃঢ়স্বরে পাপের পরিণাম সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেয় এবং স্বামীর অনুশোচনার সময় আপনার প্রেমপূর্ণ সোহাগও আদরে অভিভূত করিয়া রাখে, তাহা হইলে স্বামী পুনরায় পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতে পারে না। কিন্তু স্বামীর চিত্ত-পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিয়া প্রথমাবস্থায় স্ত্রী-যদি তাহার অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করিবার চেষ্টা না করে, কিংবা অভিমানভরে স্বামীর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্বামী

সুযোগ পাইয়া পাপে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হইয়া পড়ে এবং তখন আর তার পরিত্রাণের কোনও উপায় থাকে না।

সাধ্বী-স্ত্রী প্রণয়, যত্ন ও সেবা দ্বারা সর্ব্বদা স্বামীকে আপন প্রেমপাশে বদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিবে। ইহাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য এবং ইহাতেই সংসারের সুখ ও আনন্দ। যতদিন রিপুর প্রাবল্য থাকে, ততদিন প্রণয়ী প্রণয়িণীর ভক্তি চায় না—চায় ভালবাসা। সেই ভালবাসা দিতে স্ত্রীর কখনও কৃপণ হওয়া উচিত নহে। ভালবাসার পরিবর্ত্তে ভক্তি ও সেবা করিলে পুরুষের বাসনার পরিতৃপ্তি হয় না। তখন চিত্ত বিশেষভাবে সংযত না হইলে, সাধারণতঃ প্রলোভনে পতিত হইয়া পাপে আসক্ত হয়।

সূর্য্যমুখী পতিব্রতা স্ত্রী। স্বামীর চিত্ত তিনি সম্পূর্ণরূপে চিনিতেন এবং তাঁহার মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য স্বামী-সম্বন্ধে সূর্য্যমুখীর একটু আশঙ্কা ছিল। নগেন্দ্রের কলিকাতায় অবস্থানকালে সূর্য্যমুখী তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই আশঙ্কার আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, "একটী বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে?......নহিলে বালিকাটী পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন?"

সূর্য্যমুখী জানিতেন যে, স্বামীর রূপতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হয় নাই। সেই অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি যে প্রলোভনে পতিত হইতে পারেন, এ ধারণা ছিল বলিয়াই সূর্য্যমুখী স্বামীকে উপহাস করিয়াছিলেন; অথচ তিনি যে প্রকৃত পাপে লিপ্ত হইতে পারেন, ইহা তিনি কখনও ভাবিতে পারিতেন না। তিনি জানিতেন না যে, পুরুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ না হইলে বিনষ্ট হয় না, তাহা কেবল প্রচ্ছন্ন থাকে মাত্র এবং অবসর পাইলেই প্রকাশ পায়। ইহা জানিলে সূর্য্যমুখী স্বামীর শুধু সেবা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। তিনি নিশ্চয় স্বামীকে আপন প্রেমপাশে সতত আবদ্ধ রাখিতেন।

সূর্য্যমুখী যখন বুঝিলেন যে, স্বামীর চিত্ত অবনত হইতেছে এবং তিনি ঈষৎ উন্মনা হইয়া পড়িতেছেন, তখন তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া যদি অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিতেন এবং তন্নিরাকরণের উপায় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনে এত দুঃখ ঘটিত না। কিন্তু তিনি স্ত্রীর কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা করিয়া স্বামীসম্বন্ধে সন্দেহ হৃদয় হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিলেন এবং অভিমানিনী স্ত্রীর মত আপন হৃদয়ভার স্বামীর নিকট প্রকাশ না করিয়া, ক্ষুব্ধ-অন্তঃকরণে মনের দুঃখ ননদিনী কমলমণিকে জানাইলেন।

সূর্য্যমুখী লিখিলেন, "কি দশা? একথা কাহাকে বলিবার নহে, বলিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও করে। কিন্তু অন্তঃকরণের ভিতর যে কষ্ট, তাহা কাহাকে না বলিলেও সহ্য হয় না। আর কাহাকে বলিব? তুমি আমার প্রাণের ভগিনী, তুমি ভিন্ন আর আমাকে কেহ ভালবাসে না। আর তোমার ভাইয়ের কথা তোমাভিন্ন পরের কাছেও বলিতে পারি না।

"আমি আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছি। কুন্দনন্দিনী যদি না খাইয়া মরিত, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল? পরমেশ্বর এত লোকের উপায় করিতেছেন, তাহার কি উপায় করিতেন না? আমি কেন আপনা খাইয়া তাহাকে ঘরে আনিলাম?

"তুমি সে হতভাগিনীকে যখন দেখিয়াছিলে, তখন সে বালিকা। এখন তাহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইয়াছে। সে যে সুন্দরী, তাহা স্বীকার করিতেছি। সেই সৌন্দর্য্যই আমার কাল হইয়াছে।

"পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী।...... পৃথিবীতে যদি আমার কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ; সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।"

সূর্য্যমুখী ইহা জানিতেন যে, স্বামী-স্ত্রীর অপ্রণয়, মনোমালিন্য, অবিশ্বাস বা কলহ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নাই। কিন্তু তিনি ইহা

জানিতেন না যে, এই অপ্রণয় আপন হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া স্বামীরও অজ্ঞাতসারে তাহার প্রতিবিধান করিতে হয়।

কমলমণি ইহা জানিতেন। তিনি বুঝিতেন যে, একবার স্বামী-সম্বন্ধে অবিশ্বাস জন্মিলে এবং সে বিশ্বাসহীনতা অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে আর ধৈর্য্য থাকে না। তখন হৃদয় হইতে প্রেমের প্রভাব অল্পে অল্পে বিনষ্ট হইতে থাকে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অবিশ্বাস প্রকাশ পাইলে স্বামীর কোন উপকার হয় না এবং স্ত্রী আমরণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইয়া, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করিয়া জীবন ধারণ করা যে স্ত্রীলোকের পক্ষে কত কষ্টকর, তাহা কমলমণি জানিতেন। তিনি জানিতেন যে, এরূপ জীবনের মর্ম্মান্তিক ক্লেশের তুলনায় মৃত্যু যন্ত্রণা অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য। সেইজন্য তিনি সূর্য্যমুখীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া অপ্রসন্নচিত্তে লিখিয়াছিলেন—"তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয়প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার—তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর।··· স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।"

স্বামীর প্রতি অচল বিশ্বাস রাখিয়া, তাঁহাকে আপন অনাবিল প্রণয় ও ভালবাসায় নিয়ত প্রসন্ন রাখা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। স্বামীর চিত্ত যাহাতে অপ্রফুল্ল না হয়, কোন অভাব অনুভব করিয়া যাহাতে তিনি অবসন্ন না হন, স্বামীর সকল বাসনা যাহাতে পূর্ণ হয়, তাহার জন্য স্ত্রী সকল সময় চেষ্টা করিবেন। কিন্তু স্ত্রীর এই উদ্দেশ্য গোপন থাকা উচিত। এই উদ্দেশ্য যত গোপন থাকিবে এবং কার্য্য যত ঐকান্তিক হইবে, স্বামী ততই স্ত্রীর প্রেমপাশে বদ্ধ হইবে। স্ত্রী যদি স্বামীর সহিত এরূপভাবে ব্যবহার না করে, কিংবা স্ত্রীর নিকট যদি স্বামীর বাসনা পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে

প্রলোভনে সতত মুক্ত থাকায় এবং রিপুর প্রবল তাড়নায় পুরুষ পাপে আকৃষ্ট হইতে পারে। তখন যদি পুরুষ জানিতে পারে যে, তাহারই স্ত্রীর নিকট হইতে অন্যে তাহার পাপ-প্রবৃত্তির কথা জানিতে পারিয়াছে, তাহা হইলে সে স্ত্রীর প্রতি রুষ্ট হয় এবং লজ্জা-ভয় রহিত হইয়া যায়। তখন তাহার অধঃপতন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে এবং অতি শীঘ্রই তাহা সাধিত হয়।

কমলমণি ইহা বুঝিতেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে স্বামী কখনও স্ত্রীর অনুরাগ প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। সেই জন্যই কমল সূর্য্যমুখীকে লিখিয়াছিলেন, "স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না।"

সূর্য্যমুখী কমলমণির উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না। তিনি স্বামী-সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দূর করিয়া মনকে এই প্রবোধ দিলেন যে, শারীরিক অসুস্থতা-বশতঃ তাঁহার এইরূপ চিত্ত-বিকৃতি জন্মিয়া থাকিবে এবং চিকিৎসা করাইলে ইহার উপশম হইতে পারে।

সূর্য্যমুখী স্বামীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। স্বামীর মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার অপ্রয়াস ও বাসনা পূর্ণ করিবার অক্ষমতা দেখিয়া নগেন্দ্র স্ত্রীর প্রতি রুষ্ট হইলেন এবং স্ত্রীর নিকট হইতে প্রতীকারের কোন উপায় হইতে পারিবে না ভাবিয়া মদ্যপান আরম্ভ করিলেন।

স্বামীর এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া সূর্য্যমুখী ক্ষুব্ধ হইলেন এবং অভিমান-ভরে আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া স্বামী হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিলেন। স্বামীর কর্ম্ম আপন হস্তে লইয়া এবং তাঁহার কর্ত্তব্য নিজে সম্পন্ন করিয়া, সূর্য্যমুখী স্বামীর সহিত অভিন্ন ভাব না দেখাইয়া, তিনি সকল কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার চেষ্টা করিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে, সদর-মফস্বলের আমলাদের যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রজারা উৎপীড়িত হইতেছে এবং জমিদারীতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতেছে, তখন তিনি স্বামীর চিত্ত এ বিষয়ে আকর্ষণ না

করিয়া বা স্বয়ং প্রতিবিধানের উপায় না করিয়া অভিমানভরে বলিলেন, "যাঁহার বিষয়, তিনি রাখেন, থাকিবে। না হয়, গেল গেলই।":

এত দিন যে সূর্য্যমুখী স্বামীর সকল কর্ম্মের অনুসন্ধান ও সহায়তা করিতেন, স্বামীকে অবলম্বন করিয়াই সুখ-দুঃখে দিন কাটাইতেন, আজ সেই স্ত্রী, অভিমানভরে স্বামী হইতে দূরে থাকিয়া, নিজের হৃদয়ভার লঘু করিবার ও সহানুভূতি পাইবার আশায় কমলকে আসিতে লিখিলেন। তিনি লিখিলেন, "একবার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃদ্ কেহ নাই। একবার এসো।" সূর্য্যমুখীর রুদ্ধ-প্রেম-প্রবাহ এইরূপে কমলের প্রতি ধাবিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অভিমান ও অহঙ্কার

সূর্য্যমুখী সরল ও গম্ভীর প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন। যাহার অন্তঃকরণ সরল, যে আপনার ভাল-মন্দ বিচার করিয়া কাজ করিতে জানে না, যে অন্যের মনোভাব লক্ষ্য করে না এবং কাহারও মন-রক্ষার জন্য কখনও কাজ করে না—স্ত্রীলোকই হউক আর পুরুষই হউক, তাহার অভিমান স্বভাবতঃই একটু বেশী হইয়া থাকে।

অভিমান মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক বৃত্তি হইলেও, সাধারণতঃ লোক ইচ্ছা করিয়াই ইহা বাড়াইয়া থাকে। যখন কেহ অভিমানের প্রশ্রয় দেয়, বা অভিমানবশতঃ আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপন ইচ্ছানুসারে ছোট ছোট কাজ সম্পন্ন করে, তখন সে বুঝিতে পারে না যে, এই অভিমান ভবিষ্যতে তাহার জীবনে কত কষ্টের কারণ হইবে।

চেষ্টা করিলে অভিমান কমান যাইতে পারে। প্রকৃতিতে মজ্জাগত হইবার পূর্ব্বে, সতর্কতা অবলম্বন-পূর্ব্বক পিতা-মাতা পুত্র-কন্যার চিত্ত হইতে ইহা অনেকটা দূর করিতে পারেন। প্রথমাবস্থায় অভিমান সংযত না করিলে, তাহা এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় যে, পরে তাহার সংহার-সাধন প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। স্ত্রী-প্রকৃতিতে অভিমান দুর্জ্জয় হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ নাশ সম্ভব। ইহা করিতে হইলে স্বামীকে চেষ্টা করিতে হইবে। নগেন্দ্রনাথ এ চেষ্টা একেবারেই করেন নাই। সুতরাং সূর্য্যমুখীর অভিমান কমে নাই এবং তাহা যে কত ভয়ঙ্কর, ইহা সূর্য্যমুখী জানিতেও পারেন নাই। নগেন্দ্রনাথ যদি শ্রীশচন্দ্রের মত প্রেমময় ও ক্রোধশূন্য হইয়া সূর্য্যমুখীর সহিত ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে সূর্য্যমুখী কখনও অভিমান-ভরে স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারিতেন না। শ্রীশচন্দ্রের মত লোক সংসারে অতি অল্প, সেইজন্য দুঃখ এত অধিক।

সরলা গম্ভীর-প্রকৃতি সূর্য্যমুখী সংসারের মলিনতা বিশেষ বুঝিতে পারিতেন না। মানবের হীন-বৃত্তিগুলি তিনি ধারণা করিতে পারিতেন না, অথচ বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। সেইজন্য বৈষ্ণবীর গান শুনিয়া তিনি প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু কমলের কথা হইতে বুঝিয়াছিলেন যে, ইহা সুরুচিসঙ্গত নহে। এই জন্যই হীরার বেশ-বিন্যাস ও আতর গোলাপ প্রভৃতি গন্ধ-দ্রব্যের উপর লোভ দেখিয়াও তিনি তাহার চরিত্র-সম্বন্ধে কখনও কোন সন্দেহ করিতেন না এবং বিধবা কুন্দের সেবায় তাহাকে নিযুক্ত রাখিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। এই জন্যই অন্তঃপুরমধ্যে হরিদাসী বৈষ্ণবীর গমনাগমন দেখিয়াও প্রথমে তিনি তাহার প্রতি কোন সন্দেহ করেন নাই।

যখন সূর্য্যমুখী দেখিলেন যে, কেহই গান শুনিল না, অথচ বৈষ্ণবী বসিয়া রহিল এবং কুন্দও উঠিয়া গেল না, তখন তাঁহার সন্দেহ হইল।

স্বামীর চিত্ত বিকৃতি দেখিয়া অবধি কুন্দের প্রতি তাঁহার সংশয় হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইত যে, এই মোহিনীর আকর্ষণেই হয়ত তাঁহার সচ্চরিত্র স্বামী বিচলিত হইতেছেন। যখন সূর্য্যমুখী অন্তরাল হইতে দেখিলেন যে, বৈষ্ণবী কুন্দের সহিত কথা কহিতেছে এবং কুন্দ স্থির হইয়া শুনিতেছে, তখন তাঁহার মনে হইল, হয়ত তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া কোন পুরুষ ছদ্মবেশে আসিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতেছে। তখনই সূর্য্যমুখী কমলকে ইহা দেখাইলেন এবং বলিলেন, "আমার বোধ হয় কোন ছদ্মবেশী পুরুষ। তাহা এখনই জানিব—কিন্তু কুন্দ কি পাপিষ্ঠা!"

সূর্য্যমুখী এ ঘটনা নগেন্দ্রনাথকে না দেখাইয়া ভালই করিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবীর অনুসন্ধানে হীরাকে পাঠাইয়াও তিনি স্বামীকে এ সংবাদ দিলেন না। বরং হীরাকে বলিলেন, "দেখিস্, যেন বৈষ্ণবী কিছুই বুঝিতে না পারে। আর কেহ কিছু বুঝিতে না পারে।"

হীরা অনুসন্ধান করিয়া আসিলে, সূর্য্যমুখী সহসা কুন্দকে অসচ্চরিত্রা স্থির করিলেন। তিনি একবার বিচার করিয়া দেখিলেন না যে, এই পুরুষ বিধবা সরলা কুন্দকে প্রলুব্ধ করিয়া পাপের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কি কুন্দই তাহাকে আকর্ষণ করিয়া তথায় আনিয়াছে। কুন্দ প্রকৃত পাপিষ্ঠা কি না, ইহার কোন প্রতীকার হইতে পারে কি না, কুন্দের পাপ-বার্ত্তা দেশে প্রকাশ পাইলে কিরূপ অপযশ হইবে এবং সে অনাথা যদি নির্দ্দোষী হয়, তাহা হইলে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলে সে কি দুর্দ্দশায় পড়িবে—এ সব সম্বন্ধে সূর্য্যমুখী কোন বিচার করিলেন না বা স্বামীর সহিত পরামর্শ করিলেন না। স্ত্রীজনসুলভ প্রবৃত্তিবশতঃ সূর্য্যমুখী স্বামীকে এ ঘটনা-সম্বন্ধে কিছুই জানাইলেন না।

সূর্য্যমুখী ন্যায়ের পক্ষপাতিনী। ভদ্রকন্যা ও ভদ্র-পরিবারের উপযুক্ত স্বভাব তিনি পাইয়াছিলেন। কাহারও অন্যায় কার্য্য বা অন্যায় ব্যবহার

দেখিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাহার প্রতিবিধান করিতেন। যখন তিনি শুনিলেন যে, দেবেন্দ্রবাবু তারাচরণের গৃহে আসিয়া কুন্দের সহিত আলাপ করিয়া গিয়াছেন, তখনই তিনি তারাচরণকে এরূপ ভৎর্সনা করিয়াছিলেন যে, আর সে দেবেন্দ্রবাবুর সম্মুখে কুন্দকে বাহির করিতে পারেন নাই। নগেন্দ্রের সেই বৃহৎ সংসারে সকল ন্যায়-অন্যায়ের বিচার সূর্য্যমুখী করিতেন এবং অন্যায়ের দমন করিতে পারিতেন বলিয়া একটা:খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রকৃত গৃহিণী বলিয়া সূর্য্যমুখী সে সংসারের সকলের সম্মান প্রাপ্ত হইতেন।

যখন স্ত্রীলোক কোন বিষয়ে একটু প্রশংসা পায়, তখন সাধারণতঃ তাহার এরূপ আত্মশ্লাঘা জন্মায় যে, সে নিজেকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করে। তখন সে আর কাহারও সহিত পরামর্শ করিতে চাহে না এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার-শক্তি যে আর কাহারও আছে, এ ধারণা পর্য্যন্ত অনেক সময় করিতে পারে না। এই অহঙ্কার লইয়া স্ত্রীলোক সূক্ষ্ম অথচ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, কিন্তু তাহাদের অদূরদর্শিতার ফলে অধিকাংশ স্থলেই কুফল ফলিয়া থাকে। যাহারা অহঙ্কারের উচ্চশিখরে উঠে নাই, তাহারা আপন কর্ম্মের কুফল দেখিয়া লজ্জিত হয় এবং স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি ত্যাগ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু যাহারা অহঙ্কারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া থাকে, তাহারা আপনাপন বিচারের কুফল দেখিয়া একটী কল্পিত কারণ প্রদর্শন করাইয়া স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া থাকেন।

বিধবা কুন্দের চরিত্র-হীনতার নিদর্শন আপন চক্ষে দেখিয়া সূর্য্যমুখী অধীরা হইয়া উঠিলেন। স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হওয়া অবধি কুন্দনন্দিনীর রূপের প্রতি তাঁহার ঈর্ষানল প্রধূমিত হইতেছিল। এখন স্বামী-প্রেমে বঞ্চিতা সূর্য্যমুখী ঈর্ষা ও স্বার্থের প্রভাবে হতবুদ্ধি হইয়া কুন্দের প্রতি কঠোর বিচার করিলেন। কুন্দকে ডাকিয়া তিনি তাঁহার গৃহত্যাগ

করিয়া যাইবার জন্য তাহাকে আদেশ করিলেন। কুন্দ সেই রাত্রেই নগেন্দ্রের ভবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

নগেন্দ্র শুনিলেন কুন্দ গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু কি কারণে গিয়াছে, তাহা কাহারও নিকট শুনিলেন না। সূর্য্যমুখী এ সম্বন্ধে স্বামীকে কোন কথা বলেন নাই এবং নগেন্দ্রনাথও তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। মর্ম্মাহত হইয়া দুঃখের তীব্র জ্বালায় তিনি অহরহঃ জ্বলিতেছিলেন। অন্তরের দুঃখ তাঁহার দেহে প্রকাশ পাইল। সে দুঃখচিহ্ন সূর্য্যমুখীর চিত্ত আকর্ষণ করিল। তখন কুন্দের প্রতি আচরণ স্মরণ করিয়া সূর্য্যমুখী ক্ষুব্ধা হইলেন।

কুন্দকে তাড়াইয়া সূর্য্যমুখী ভাবিয়াছিলেন যে, স্বামী কুন্দকে কিছুদিন না দেখিলেই তাহাকে বিস্মৃত হইবেন। রূপের কুহকে পড়িয়া যখন কেহ ঈষৎ বিচলিত হয়, তখন রূপসীর অদর্শন চিত্তবিকৃতি নষ্ট করে। কিন্তু যখন কাহারও চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়া প্রণয়িনীর চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে, তখন বিচ্ছেদ ও অদর্শন অসহ্য হইয়া উঠে। মোহ ও প্রণয়ের প্রভাব সূর্য্যমুখী বুঝিতেন না, সেই জন্য কুন্দনন্দিনীর অদর্শন যে স্বামীর চিত্তে কিরূপ দুঃখের সঞ্চার করিবে, তাহার ধারণা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যখন স্বামীর ম্লানমুখ এবং চিত্তের চাঞ্চল্য, অশান্তি ও অন্যমনস্কতা দেখিলেন, তখন তাঁহার জ্ঞান হইল। কুন্দের প্রতি স্বামীর অনুরাগ ও মোহের প্রভাব তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন। কুন্দকে তাড়াইয়া যে অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনি স্বয়ং কুন্দনন্দিনীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুশোচনার তাড়নায় তাঁহার চিত্ত হইতে অভিমান অপগত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে নগেন্দ্রনাথ হীরার নিকট শুনিলেন যে, সূর্য্যমুখীর তিরস্কারে কুন্দ গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। নগেন্দ্র চিত্ত সংযত করিয়া, ক্রোধের

কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া, সূর্য্যমুখীর নিকট গেলেন এবং সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছিলে ?"

তীব্র অনুশোচনায় তখন সূর্য্যমুখীর অভিমান সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছিল। তিনি সরল স্পষ্টভাবে কুন্দনন্দিনী-সম্বন্ধে সকল কথা স্বামীকে বলিলেন। এতদিন এ কথা তাঁহাকে না বলিয়া যে তিনি অন্যায় করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলেন। যে সন্দেহ তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছিল, তাহাও অকপটে তিনি স্বামীর নিকট বলিলেন। তাঁহার কোমল হৃদয় যে স্বামীর এই ব্যবহার সহ্য করিতে অক্ষম, তাহাও তিনি জানাইলেন। প্রেম, ভক্তি ও সেবার বিনিময়ে স্বামীর সুখ ও ভালবাসাই যে তাঁহার একমাত্র প্রার্থনীয়, তাহা সূর্য্যমুখী বলিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি স্বামীর সহানুভূতি পাইলেন না। স্ত্রীর হৃদয়ের রক্ত অশ্রুরূপে প্রবাহিত হইয়া স্বামীর চরণ সিক্ত করিল, কিন্তু তাহাতেও স্বামী স্বীয় সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না।

যখন নগেন্দ্রনাথ তাঁহার কঠোর সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিধবা— এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম," তখন সূর্য্যমুখী শোকে অভিভূতা হইয়া পড়িলেন। সমস্ত পৃথিবী তাঁহার নিকট স্তব্ধ বলিয়া বোধ হইল, ক্ষণিকের জন্য তাঁহার শরীরে রক্ত-চলাচল যেন বন্ধ হইল, তিনি ভূতল-শায়িনী হইলেন। সেই দারুণ শোকে সূর্য্যমুখীর অভিমানশূন্য চিত্তে অপূর্ব্ব স্বামী-প্রেম উদিত হইল। সেই প্রেমের প্রভাবে তিনি সর্ব্বত্রই স্বামীময় দেখিলেন। তিনি দেখিলেন—অন্তরে স্বামী, বাহিরে স্বামী, সম্মুখে স্বামী, পশ্চাতে স্বামী। স্বামীর সেই অসংখ্য মূর্ত্তির মধ্যে সাধ্বী-স্ত্রী নিজেকে অতি ক্ষুদ্র, অতি হীন বলিয়া মনে করিলেন। স্বামীর এই বিরাট্ আকারের মধ্যে সূর্য্যমুখী নিজেকে অন্তর্হিতপ্রায় দেখিলেন।

যে প্রগাঢ় প্রণয়ের জন্য স্ত্রী স্বামীর জ্বলন্ত-চিতায় প্রবেশ করিতে ভীত হইত না, যে অচ্ছেদ্য বন্ধন, ভক্তি ও ভালবাসার জন্য স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরেও স্বামীর সাহচর্য্য অনুভব করিয়া এবং তাঁহারই চরণ অবলম্বন করিয়া অক্লেশে বৈধব্য-জীবন যাপন করিয়া থাকেন, আর্য্য-নারীর সেই আদর্শ প্রণয় সূর্য্যমুখীর চিত্তে প্রকাশ পাইল, তখন সেই পতিব্রতা, পতি-প্রাণা স্ত্রী আপন সুখাকাঙ্ক্ষা স্বামীর সুখের জন্য বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন এবং স্বামীর সন্তোষের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিবেন স্থির করিলেন।

যে স্ত্রী স্বামীর সুখের জন্য আত্মপ্রাণ বলি দিতে পারে, তাহার পক্ষে স্বামীর জন্য অদেয় কিছুই থাকিতে পারে না এবং তাঁহারই সুখ ভিন্ন প্রার্থনার কিছুই থাকে না। যে দেশের স্ত্রীলোক আপন আহার ও পানীয় দিয়া স্বামীর জীবন রক্ষা করিয়া হাস্যমুখে ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে, সেই দেশে যে স্বামীর সুখের জন্য স্ত্রী জাগতিক সুখ ও বাসনা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি থাকিতে পারে? স্বামীর প্রণয়লাভে বঞ্চিতা সূর্য্যমুখী আর বিচলিত হইলেন না। তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং স্বামীর চরণ বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"এক ভিক্ষা"।

সূর্য্যমুখী স্বামীকে আর একমাসমাত্র গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন, নগেন্দ্রনাথ এ অনুরোধ রক্ষা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐকান্তিকতা

সূর্য্যমুখী কুন্দনন্দিনীর অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সংবাদ পান নাই। এখন আর একমাস মাত্র সময়। যদি এই সময়ের মধ্যে কুন্দকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি স্বামীকে রক্ষা করিতে পারিবেন, নচেৎ তাঁহার অদৃষ্টে যে কি হইবে, তাহা ভগবানই জানেন।

সূর্য্যমুখী দিবারাত্র ঈশ্বরের নিকট এই কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যেন তিনি স্বামীকে রক্ষা করিতে পারেন। কুন্দনন্দিনীকে ফিরিয়া পাইবার আশা তাঁহার ছিল না, অথচ অন্তরের সহিত তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সাধ্বীর সে প্রার্থনা দয়াল ঈশ্বর শুনিলেন। তিনি অচিরেই সূর্য্যমুখীর প্রার্থনা পূর্ণ কারলেন। পুষ্পচয়নরতা সূর্য্যমুখীর সম্মুখে সহসা কুন্দনন্দিনীকে এমনভাবে উপস্থিত করিলেন যে, তিনি ইহা দৈবানুগ্রহ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করিতে পারিলেন না। তখন সূর্য্যমুখী সাদরে কুন্দের হাত ধরিলেন এবং বলিলেন, "কুন্দ! এসো—দিদি এসো! আর আমি তোমায় কিছু বলিব না।"

সূর্য্যমুখী কুন্দনন্দিনীর হাত ধরিয়া অতি যত্নে তাহাকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন। কুন্দের এরূপ অচিন্তিত-পূর্ব্ব মিলন সূর্য্যমুখী দেবতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে করিলেন। ভগবানের অনুগ্রহে তাহার কাতর প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া সূর্য্যমুখী অন্তরে অসীম শক্তি অনুভব করিলেন। সেই শক্তির তেজে অন্য সকল বৃত্তি বিনষ্ট হইল। ভোগাকাঙ্ক্ষা, সুখকামনা, অভিমান, ঈর্ষা প্রভৃতি সকল হীনপ্রবৃত্তি এককালে ধ্বংস হইল। তাঁহার অন্তরে তখন রহিল কেবল—প্রেম।

যে প্রেমের প্রভাবে যোগী সুখের আলয়, আত্মীয়-স্বজন ও পার্থিব সকল সুখ ত্যাগ করিয়া আনন্দে গহনবনে বাস করেন, যে প্রেমের প্রভাবে সন্ন্যাসী পথপর্য্যটনশ্রম ও অনাহার অনিদ্রা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভগবানের স্বরূপ অনুভূতির আশায় দূরস্থিত তীর্থস্থানে গমন করেন, যে প্রেমের প্রভাবে সাধক ঋতুর প্রকোপ সহ্য করিয়াও ভগবানের সাহচর্য্য অনুভব করিয়া অপার আনন্দে বিভোর হইতে পারেন—সেই দুর্ল্লভ প্রেমে সূর্য্যমুখীর অন্তর পবিত্র হইল। সেই প্রেমের প্রভাবে সূর্য্যমুখী আপন স্বামীকে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত দেবতা এবং নিজেকে পূজারতা ভক্ত বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহার সেই হৃদয়-মন্দিরে বিরাজিত স্বামীর তুলনায় জাগতিক প্রেমোন্মত্ত নগেন্দ্রনাথ অনেক হীন বলিয়া বোধ হইল। তখন সূর্য্যমুখী বাহিরের নগেন্দ্রকে ছাড়িয়া অন্তরের নগেন্দ্রনাথের পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

স্বামীর সুখোপকরণ কুন্দনন্দিনীকে সূর্য্যমুখী যথেষ্ট যত্ন ও আদর করিতে লাগিলেন এবং কুন্দকে বিবাহ করিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। এমন সরল স্বাভাবিক-ভাবে তিনি স্বামীর সহিত এ বিবাহ সম্বন্ধে কথা কহিতেন যে, নগেন্দ্র মনে করিতেন, ইহা স্ত্রীর বাঞ্ছনীয়। নগেন্দ্রনাথ স্ত্রীর মনোভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তখনও সূর্য্যমুখীকে আপন বিবাহিত স্ত্রী বলিয়া মনে করিতেছিলেন—পবিত্রতরা দেবী বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই।

কুন্দকে বিবাহ করিতে সম্মত করিয়া সূর্য্যমুখী কুন্দের সহিত স্বামীর বিবাহ দিলেন। স্বামীকে রক্ষা, তাঁহার সন্তোষ ও আনন্দোৎপাদন, তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি ও কর্ম্মশীলতার জন্য স্ত্রীর কঠোর সাধনা আজ পূর্ণ হইল। নগেন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা এতদিনে চরিতার্থ হইল এবং তাঁহার বেদনাক্লিষ্ট মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। স্বামীর সে প্রফুল্লতা সূর্য্যমুখী দেখিলেন, কিন্তু

আপন হৃদয়-নিহিত সংযত পবিত্র প্রেমময় স্বামীর নির্ম্মল আকৃতির তুলনায় তাহা অতি নিকৃষ্ট সমল বলিয়া বোধ হইল। তখন সূর্য্যমুখী তাঁহার হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত সেই আদর্শ স্বামীর নির্ম্মলতা ও দেবভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অন্তরালে যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আত্মবিসর্জ্জন

কুন্দনন্দিনীর সহিত স্বামীর বিবাহ স্থির করিয়া সূর্য্যমুখী কমলকে আসিতে লিখিলেন। তিনি যেভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা বেশ প্রকাশ পায় এবং এরূপ বিবাহেও যে তিনি আনন্দ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারও আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, "কুন্দের সঙ্গে আমার স্বামীর বিবাহ হইবে। এ বিবাহে আমিই ঘটক। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রে আছে—তবে দোষ কি? দুই একদিনের মধ্যে বিবাহ হইবে। তুমি আসিয়া জুটিতে পারিবে না—নচেৎ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতাম। পার যদি, তবে ফুলশয্যার সময়ে আসিও।" স্বামীকে সুখী দেখিবার জন্য যে সূর্য্যমুখীর আন্তরিক বাসনা জন্মিয়াছিল, তাহার বলেই তিনি এরূপ নিমন্ত্রণ-পত্র লিখিতে পারিয়াছিলেন।

অভূতপূর্ব্ব মানসিক শক্তি ও চিত্তের দৃঢ়তার সহিত সূর্য্যমুখী যে কিরূপ হাস্যমুখে কুন্দের সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহা নব-বিবাহিত নগেন্দ্রের মনোভাব হইতে বেশ প্রকাশ পায়। বিবাহের পরদিন নগেন্দ্রনাথ ভাবিতেছিলেন, "কুন্দনন্দিনী! কুন্দ আমার! কুন্দ আমার স্ত্রী! কুন্দ!

কুন্দ! কুন্দ! সে আমার! সূর্য্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছে—তবে আমার এ সুখে আর কাহার আপত্তি?" যদি বিবাহ-রাত্রে নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর চোখের জল দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে কুন্দের প্রতি মোহ যত অধিক হউক না কেন, তাঁহাকে নিশ্চয় মধ্যে মধ্যে ক্ষুব্ধ হইতে হইত।

সূর্য্যমুখীর পত্র পাইয়া কমলমণি গোবিন্দপুরে আসিলেন। পথে আসিবার সময় সূর্য্যমুখী-সম্বন্ধে কমলের মনে এক দারুণ সন্দেহ হইতেছিল। পতিপ্রেমমুগ্ধ-হৃদয়া স্ত্রী স্বামীকে অন্যাসক্ত বা পরস্ত্রীর অঙ্কশায়ী দেখিলে জীবনধারণ করিতে পারে না, এরূপ বিশ্বাস থাকায় তিনি ভাবিতেছিলেন—হয়ত সূর্য্যমুখী স্বামীর বিবাহের পরেই আত্মহত্যা করিয়াছে। শঙ্কাকুল-চিত্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া কমল প্রথমেই সূর্য্যমুখীর শয়নাগারে যাইলেন। তথায় এক রুদ্ধ-গবাক্ষতলে সূর্য্যমুখীকে অধোবদনে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। কমলমণি সূর্য্যমুখীর সম্মুখে বসিলেন।

কমলকে দেখিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সূর্য্যমুখীর চিত্তের দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহাকে এখন যে নূতন অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল এবং এখন হইতে যেভাবে তাঁহাকে জীবন-ধারণ করিতে হইবে, তাহারই চিন্তায় তিনি কালযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু কমলমণি সম্মুখে বসিলে তাঁহার সুখের জীবনের সকল স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত হইল। তখন হৃদয়ের দৃঢ়তা এক মুহূর্ত্তে নষ্ট হইল। নিজের জীবনের পরিবর্ত্তন স্মরণ করিয়া সূর্য্যমুখী কমলের কোলে মুখ লুকাইয়া আবেগভরে বহুক্ষণ রোদন করিলেন।

আবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, সূর্য্যমুখী স্বামীর সহিত কুন্দের বিবাহের সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। স্বামীর চিত্তে সুখোৎপাদনের জন্য যে আত্মত্যাগ-প্রবৃত্তি-বশতঃ তিনি স্বামীকে এ বিবাহে প্ররোচিত করিয়াছিলেন, তাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তাঁহার এত সুখ

যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? যাঁহার একদণ্ডের অসুখ দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে, দেখিলাম, দিবা-রাত্র তাঁর মর্ম্মান্তিক অসুখ—তিনি সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দেশত্যাগী হইবার উদ্যোগ করিলেন—তবে আমার কি সুখ হইল?"

পতিপ্রাণা হিন্দুস্ত্রীর পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম সম্পূর্ণ করিবার জন্য সূর্য্যমুখী স্বামীর সুখে সুখ অনুভব করিয়া, আপন জীবনে মরণান্তক ক্লেশের সৃষ্টি করিয়া, স্বামীকে এ বিবাহে সম্মত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রভু! তোমার সুখই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর—আমি সুখী হইব। শুধু মুখের বলা নয়, অন্তরের সহিত এ কথা বলিয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী প্রকৃতসুখ অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই হাসিমুখে স্বামীর বিবাহ দিতে পারিয়াছিলেন।

কমলের সহিত কথা কহিতে কহিতে সূর্য্যমুখীর চিত্তের দৃঢ়তা নষ্ট হইল। দুঃখের জ্বালায় তাঁহার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার সেবা, ভক্তি ও ভালবাসার বিনিময়ে যে স্বামী এরূপ ভাবে তাঁহাকে পায়ে ঠেলিলেন এবং পায়ে ঠেলিয়া এত আনন্দ অনুভব করিতেছেন, এই চিন্তায় তিনি অত্যন্ত দুঃখবোধ করিলেন। তখন অন্তরের দুঃখ ও অভিমান অশ্রুরূপে প্রকাশ পাইল।

ক্ষণিকের মধ্যে অভিমান ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত দৃঢ়স্বরে সূর্য্যমুখী বলিলেন, 'যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য "অনুতাপ করি না। ভালই করিয়াছি, ইহাতে আমার কোন সংশয় নাই। কিন্তু মরণের ত যন্ত্রণা আছেই। আমার মরণই ভাল বলিয়া আপনার হাতে আপনি মরিলাম।"

সূর্য্যমুখী জানিতেন যে, কমল তাঁহাকে ভালবাসে। কমল যে পরের দুঃখ অনুভব করিতে পারেন এবং একের দুঃখ লইয়া অন্যের নিকট উপহাসচ্ছলে আলোচনা করেন না, তাহা তিনি জানিতেন। সেই জন্য

আজ সূর্য্যমুখী তাঁহার মরণান্তক দুঃখের কথা পাড়িয়া কমলের নিকট কাঁদিলেন। সূর্য্যমুখীর অন্তরে আজ যে কেন এত দুঃখ জাগিতেছিল, তাহা কমল বুঝিতে পারেন নাই। এই রাত্রিই যে সূর্য্যমুখীর সংসার-সুখের শেষরাত্রি, তাহা কমল জানিতে পারেন নাই। যদি কমল সূর্য্যমুখীর অন্তরের অবস্থা বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি কিছুতেই তাঁহার সঙ্গ আজ ত্যাগ করিতেন না।

সূর্য্যমুখী কমলের সহিত তাঁহার স্বামী-পুত্রের সম্বন্ধে অনেক কথা কহিলেন। পরে রাত্রি অধিক হইলে কমলকে শুইবার জন্য উঠিতে বলিলেন।

ইতিমধ্যে সূর্য্যমুখীর অন্তর স্বামী-প্রেমে আচ্ছন্ন হইল। স্বামীই যে স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব, স্বামীই যে স্ত্রীলোকের দেবতা এবং স্বামীই যে সর্ব্ব-গুণাধার ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এ ভাব তাঁহার চিত্তে জাগ্রত হইল। যে স্বামীকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া সূর্য্যমুখী পূজায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষের ধারণা তিনি কখনও করিতে পারেন নাই এবং আজও করিতে পারিলেন না। সেই জন্য কমলমণিকে বিদায় দিবার সময় তিনি মুগ্ধান্তঃকরণে সতীশকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয়গুণে গুণবান্ হও। ইহার বাড়া আশীর্ব্বাদ আর আমি জানি না।"

কমল সতীশকে লইয়া শুইতে গেলেন। তখন সূর্য্যমুখী গৃহে একাকী বসিয়া কমলের জন্য একখানি চিঠি লিখিলেন। স্বামীকেও লিখিবার জন্য অনেকবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রত্যেকবারেই চক্ষের জলে কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইল। তিনি জন্মের মত স্বামী ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন; সুতরাং স্বামীকে প্রণাম জানাইয়া এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু লিখিয়া তিনি তাহা জানাইতে পারিলেন না। এ

সংবাদ স্বামীকে জানাইবার জন্য কমলকে অনুরোধ করিয়া তিনি তাঁহার নিকট বিদায় চাহিলেন? রাত্রে কমলকে বিদায় দিবার সময় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন নাই। সেইজন্য কমলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া লিখিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক। তুমি চিরসুখী হও। আরও আশীর্ব্বাদ করি যে, যেদিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেইদিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়।" স্বামী-গতপ্রাণা, স্বামীসর্ব্বস্বা সূর্য্যমুখী দেবতুল্য পুরুষোত্তম স্বামীর মূর্ত্তি ও চিন্তা অন্তরে লইয়া নগেন্দ্রনাথ ও সকল সুখ বর্জ্জন করিয়া গভীর রাত্রে ভিখারিণী-বেশে গৃহত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্বামী-সন্দর্শন-বাসনা

ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু সুখ-দুঃখকে ভগবানের দান মনে করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন ভগবচ্চরণে জ্ঞাপন করিয়া থাকে। যখন কেহ প্রভূত সম্মান ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তখন অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ভবিষ্যৎ বিপদ্ নিবারণের জন্য সে সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী সুখদাত্রী অন্নপূর্ণা ও বিপদ-ভয়-বারিণী বরদা দুর্গাদেবীর শ্রীচরণোদ্দেশে বারাণসী যাত্রা করিয়া থাকে। আবার যখন কেহ দুঃখের পীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া জীবন দুর্ব্বহ মনে করে, কিংবা সকল সুখশান্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যখন সংসার কাহারও প্রতি বিমুখ হইয়া দাঁড়ায়, তখন সে বিশ্ব-শাসনকর্ত্তা দেবাদিদেব বিশ্বনাথের দয়ার ভিখারী হইবার জন্য কাশী যাত্রা করে।

ইহা ভিন্ন যে কত সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী, দণ্ডী, যোগী এই মহাতীর্থে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার ইয়ত্বা করা যায় না।

সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া হৃদয়ের অশান্তি নাশ করিবার জন্য বারাণসী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিছুদূর পদব্রজে যাইয়া এক ব্রাহ্মণ-পরিবারের সঙ্গে তিনি কাশীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মানব-প্রকৃতির বিশেষত্ব এই যে, কেহ বাস্তব পদার্থ ভিন্ন ভাব-পদার্থে অধিকদিন আসক্তি বা অনুরাগ রাখিতে পারে না। বাস্তব পদার্থে যত সহজে এবং যেরূপ অবিচলিতভাবে চিত্ত সংস্থাপন করিতে পারা যায়, নিরাকার, অসম্ভব বা অপ্রাপ্ত দ্রব্যে সেরূপ করিতে পারা যায় না। সেই জন্য প্রণয়িনী প্রণয়ীর মূর্ত্তি সকল সময় আপন চক্ষের সম্মুখে রাখিতে চাহে এবং প্রণয়ীর অবর্ত্তমানে যদি কেহ প্রণয়িনীর সম্মুখে পতিপ্রেম ও সোহাগের কথা পাড়ে, তাহা হইলে সেই স্ত্রী অন্যের নিকট হইতে চক্ষু ফিরাইয়া একবার স্বামীর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া লইয়া থাকে। মূর্ত্তি না থাকিলে প্রেম থাকিতে পারে না। সেইজন্য যাঁহারা প্রেমের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আপন ইষ্টদেবতাকে অতি মনোহর নয়নরঞ্জনরূপে সজ্জিত করিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

সূর্য্যমুখী প্রেমের উপাসনা করিতেন—মোহ তাঁহার অন্তরে ছিল না রমণীয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বামীকে মনোরম সজ্জায় সজ্জিত করিয়া তিনি অহরহঃ পূজা করিতেন। কিন্তু গ্রহ-বৈগুণ্যে যখন সেই স্বামী ত্যাগ করিয়া সূর্য্যমুখীকে দেশান্তরে যাইতে হইল, তখন তিনি সেই স্বামীর রূপ ও চিন্তা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

প্রথমে কিছুদিন সূর্য্যমুখীর অন্তরে স্বামীর রূপ উজ্জ্বল-মূর্ত্তিতে বিরাজ করিল। সেই মূর্ত্তির পূজা করিতে করিতে সূর্য্যমুখী কাশীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে মূর্ত্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে

লাগিল। তখন সূর্য্যমুখীর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কাশী যাইবার জন্য আর তাঁহার তেমন আগ্রহ রহিল না। কিন্তু যখন তাঁহার মনে হইল যে, এরূপভাবে আরও কিছুদিন থাকিলে স্বামীর মূর্ত্তি চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইতে পারে, তখন বিদেশ-যাত্রা তাঁহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। পাছে, স্বামীর মূর্ত্তি তিনি হারাইয়া ফেলেন, এই ভয়ে কাতর হইয়া সূর্য্যমুখী ব্রাহ্মণ-পরিবারের নিকট বিদায় লইলেন এবং স্বামার চিন্তা করিতে করিতে, স্বামীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বিপদ-সঙ্কুল পথে নির্ভয়ে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সূর্য্যমুখী গোযান হইতে অবতরণ করিলেন। সেই পার্ব্বত্য বনময় পথে—যেখানে এখনও মানুষ দিবাভাগে একাকী গমনাগমন করিতে সাহস করে না, সূর্য্যমুখী সেইখানে একাকী দাঁড়াইলেন। সেই বন্যজন্তু-সমাকীর্ণ পথে যে, পদে পদে তিনি বিপদাক্রান্ত হইতে পারেন, এ চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে একবারও উত্থিত হইল না। দিবাভাগ কোনরূপে কাটিলেও রাত্রে যখন পথপার্শ্বে বিশ্রাম লইতে হইবে, তখন বন্যজন্তুর আক্রমণ ভাবিয়া সে কোমল স্ত্রী-হৃদয় ভীত হইল না। পথ-হাঁটা অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও এতদূর পথপর্য্যটন স্মরণ করিয়া সূর্য্যমুখী এ সংকল্প ত্যাগ করিলেন না।

সূর্য্যমুখী গৃহাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন। যে প্রেমের প্রভাবে ঈষৎ-দৃষ্ট কুম্ভীর-গাত্রকে জল-বিহার-রত শ্রীহরির অঙ্গ-ভ্রমে নিত্যানন্দদেব নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন, যে গভীর প্রেমের আকর্ষণে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব ছুটিয়া একাকী বৃন্দাবনের পথে বাহির হইয়াছিলেন, আজ সেই গভীর প্রেমের প্রভাবে সূর্য্যমুখী একাকী পথবাহন করিতে লাগিলেন। পতিপ্রেম ও পতিচিন্তা তাঁহাকে এরূপভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল যে, পথপর্য্যটন-শ্রম তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তাঁহার চিত্ত স্বামীর

ধ্যানে নিশিদিন এরূপ নিবিষ্ট হইল যে, তিনি সকল সময় বিশ্বপতির অনন্ত-শক্তিতে শক্তিমান স্বামীর মূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলেন। স্বামী স্ত্রীকে রক্ষা করিতেছেন, তখন আর স্ত্রীর কোন্ ভয় থাকিতে পারে? স্বামীর পার্শ্বে স্ত্রী পথবাহন করিতেছেন এবং স্বামীর সহানুভূতি ও ভালবাসাপূর্ণ মুখ দেখিতে পাইতেছেন—তখন কোন্ ক্লেশ স্ত্রীকে ব্যথিত করিতে পারে? সূর্য্যমুখী মহা আনন্দে ও উৎসাহে পথ চলিতে লাগিলেন।

যখন অন্তরে উৎসাহ ও সাহস থাকে, তখন শরীরও অধিকতর কর্ম্মক্ষম হয়। কিন্তু উৎসাহবশতঃ শরীরকে অত্যধিক কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিলে, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে; তখন ব্যাধি আসিয়া শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

অনাহার, স্বল্পাহার, অনিদ্রা, অবিশ্রাম, শীত-গ্রীষ্ম, রৌদ্র-জল সহ্য করিয়া সূর্য্যমুখী গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। সে অসীম পরিশ্রম ও অত্যাচার তাঁহার শরীর আর সহ্য করিতে পারিল না। বর্ষাকালে রোগ-গ্রস্ত হইয়া মধুপুরের অনতিদূরে পথপার্শ্বে তিনি শয়ন করিলেন। তাঁহার রুগ্ন শরীর পতিচিন্তা-পরায়ণ হৃদয়কে স্বামীর নিকট লইয়া যাইতে পারিল না ভাবিয়া, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তখন মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন কামনাই তাঁহার রহিল না। যত শীঘ্র মৃত্যু হয়, ততই তাঁহার মঙ্গল, কিন্তু স্বামীকে না দেখিয়া এরূপ মৃত্যুতে তাঁহার কোন সুখ ছিল না।—

বর্ষার জলধারার মধ্যে সূর্য্যমুখী মৃত্যুর কামনা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইল না। তিনি যে এই ভাবে কতদিন শুইয়া রহিলেন, তাহা কেহই জানিল না। অনাহার ও রোগবৃদ্ধিবশতঃ অচেতন প্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন সময় একজন ব্রহ্মচারী সেই পথ দিয়া কাশী-অভিমুখে যাইতেছিলেন। তখন রাত্রি হইয়াছিল। নির্জ্জন পথে চলিতে চলিতে ব্রহ্মচারী—এক দীর্ঘ-নিশ্বাস-সহিত শব্দ শুনিতে পাইলেন—"মা গো।" শব্দ মনুষ্য-কণ্ঠোচ্চারিত বোধ হইল। ব্রহ্মচারী স্তব্ধ হইয়া তথায় দাঁড়াইলেন।

বিদ্যুতের আলোকে তিনি দেখিলেন, একজন মানুষ পড়িয়া আছে এবং অনুভব করিয়া বুঝিলেন, একজন স্ত্রীলোক। তখন সেই ব্রহ্মচারী অচেতন স্ত্রীলোকটিকে কোলে তুলিয়া গ্রামাভিমুখে যাইলেন। গ্রামে পৌঁছিয়া তাঁহার এক বৈষ্ণবী শিষ্যার গৃহে এই স্ত্রীলোককে লইয়া ব্রহ্মচারী উঠিলেন।

বৈষ্ণবীর সাহায্যে স্ত্রীলোকের বসন পরিবর্ত্তন করাইয়া, সেঁক-তাপ করিয়া ও কিছু দুগ্ধ খাওয়াইয়া ব্রহ্মচারী স্ত্রীলোকের চেতনা সম্পাদন করিলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে স্ত্রীলোক বলিলেন—"আমার নাম সূর্য্যমুখী।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রেমের মাহাত্ম্য

ব্রহ্মচারীর সারা-রাত্র-ব্যাপী সেবায় সূর্য্যমুখী কিছু সুস্থ-বোধ করিলেন। পরদিন ব্রহ্মচারী তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। ব্রহ্মচারীকে এরূপ সেবা-যত্ন করিতে দেখিয়া সূর্য্যমুখী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর! আপনি আমার জন্য এত যত্ন করিতেছেন কেন? আমার জন্য ক্লেশের প্রয়োজন নাই। মরাই আমার মঙ্গল। কিন্তু মরণেও আমার আনন্দ নাই।"

ব্রহ্মচারী সূর্য্যমুখীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, ভদ্র-ঘরের কন্যা দারুণ মনোকষ্টে গৃহত্যাগ করিয়া এই বিপদে পড়িয়াছে। অন্তরের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন, "আমাকে পুত্র বিবেচনা করিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বল। যদি তোমার দুঃখ নিবারণের কোন উপায় থাকে, আমি তাহা করিব। তোমার যে

উৎকট মনঃপীড়া আছে, তাহাও বুঝিতেছি। আমাকে সন্তান মনে করিয়া বল।”

সূর্য্যমুখী জানিতেন যে, মৃত্যু ভিন্ন তাঁহার কোন উপায় নাই। বাঁচিয়া থাকিয়া স্বামীর সেবা করিতে পাইলে তাঁহার পক্ষে স্বর্গসুখ বটে, কিন্তু তাহাতে স্বামীর সুখে ব্যাঘাত হইবে। সুতরাং, স্বামীর সুখের জন্য তাঁহাকে স্বামী-সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া, তাঁহার নয়নান্তরালে থাকিতেই হইবে। স্বামী এবং স্বামী-সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবনধারণ অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ মনে করিয়া সূর্য্যমুখী বলিলেন, “আমার মনোদুঃখ কিছুই নয়—কেবল মরিবার সময় যে স্বামীর মুখ দেখিতে পাইলাম না, এই দুঃখ। মরণেই আমার সুখ—কিন্তু যদি তাঁহাকে না দেখিয়া মরিলাম, তবে মরণেও দুঃখ! যদি এ সময়ে একবার তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে মরণেই আমার সুখ।”

স্বামিপ্রেমে সূর্য্যমুখীর অন্তর এখন মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার মানস-মন্দির-স্থিত দেবতার যে কোন দোষ হইতে পারে, সে ধারণা এখন সূর্য্যমুখীর চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। পতিপ্রাণা স্ত্রীর এই অসীম শারীরিক ক্লেশ তাঁহার আপন কর্ম্মফল বলিয়া বোধ হইল। আপন পাপের প্রতিফল ভোগ করিতে হওয়ায়, প্রথমে সূর্য্যমুখী স্বামীকে তাঁহার দুঃখের কারণ স্থির করিয়াছিলেন বলিয়া এখন অন্তরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। পবিত্র-অন্তঃকরণে সূর্য্যমুখী আপনাকেই সকল দুঃখের কারণ স্থির করিয়া বলিলেন, “আমি তাঁহার কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী—তবে তিনি আমার পক্ষে দয়াময়—ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু তিনি অনেক দূরে আছেন—আমি ততদিন বাঁচিব কি?”

ব্রহ্মচারী নগেন্দ্রনাথকে পত্র লিখিলেন। সূর্য্যমুখী স্বামীর শ্রীচরণ-দর্শন-মানসে কাতর-হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারীর সেবায় ও বৈদ্যের চিকিৎসায় সূর্য্যমুখী ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহই নগেন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন, কিন্তু কোন দিনই তাঁহার আশা পূর্ণ হইত না। স্বামীর অদর্শন আর তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার চিত্তের ব্যগ্রতা ব্রহ্মচারীর নিকট প্রকাশ করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। সাধ্বীর সে অনুনয়, সে কাতরতা ব্রহ্মচারী আর অবহেলা করিতে পারিলেন না। সূর্য্যমুখী ঈষৎ সবল হইলে, তিনি তাঁহাকে গোবিন্দপুরে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

স্বামীর সহিত সূর্য্যমুখীর এই মিলনাকাঙ্ক্ষায় যদি সংসারের মলিনতার লেশমাত্রও থাকিত, তাহা হইলে তিনি সংসার-বিরাগী পুরুষের নিকট স্বামীসন্দর্শনের জন্য এরূপ কাতরতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। কিন্তু এখন নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ছিল না। এখন তাঁহাদের সম্বন্ধ আরও পবিত্র, আরও স্বর্গীয় হইয়াছিল। এখন হইয়াছিলেন, স্বামী গুরু—স্ত্রী শিষ্যা, স্বামী দেবতা—স্ত্রী সেবিকা, স্বামী ঈশ্বর—স্ত্রী উপাসক। এরূপ সম্বন্ধ প্রকাশ করিতে কাহারও নিকট লজ্জা হয় না। বরং যে এরূপ দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের জন্য আবেগ ও কাতরতা দেখে, তাহার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়।

স্বামীর জন্য সূর্য্যমুখীর আবেগ দেখিয়া ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইল। সূর্য্যমুখীকে পরম সাধ্বী, পতিপ্রাণা স্থির করিয়া ব্রহ্মচারী তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য একদিন তাঁহাকে লইয়া গোবিন্দপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গোবিন্দপুরে উপস্থিত হইয়া যখন ব্রহ্মচারী শুনিলেন যে নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তখন এই যুগ্ম-হৃদয়ের প্রতি তাঁহার অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা হইল। এরূপ স্বামী-স্ত্রীর মিলন সংঘটিত করা, এরূপ

দেবোপম চরিত্রের সেবা ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি আপন কর্ম্মত্যাগ করিয়া নগেন্দ্রের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। যাত্রাকালে তিনি সূর্য্যমুখীকে গোবিন্দপুরের অনতিদূরে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আপন কন্যা বলিয়া রাখিয়া গেলেন।

সূর্য্যমুখী সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে থাকিয়া কেবল স্বামীর চিন্তা করিতেন এবং স্বামীর শ্রীচরণ-দর্শন-বাসনা করিতেন। তখন অন্য কোন জিনিষের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল না। তাঁহার সুখের আলয়, নানা বিলাসোপ-করণ, বহু কুটুম্বিনী, দাস-দাসীর সেবা ও সকল প্রকার ভোগ-সুখ তাঁহার চিত্তকে নিমেষের জন্য বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি সতত একান্তে স্বামী-সন্দর্শন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে ব্রহ্মচারী নগেন্দ্রের অনুসন্ধান করিয়া তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার নিকট স্বামী-সম্বন্ধে সকল সংবাদ পাইলেন। তিনি শুনিয়া ছিলেন যে, তাঁহার স্বামী দুই এক দিনের মধ্যেই দেশে ফিরিবেন। সূর্য্যমুখী স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

নির্দ্ধারিত দিবসে সূর্য্যমুখী গোবিন্দপুরে আসিলেন কিন্তু শুনিলেন যে সেদিন নগেন্দ্রনাথ বাড়ী ফিরেন নাই। পরদিন ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধ্যার পর আবার গোবিন্দপুরে আসিলেন। সেদিন শুনিলেন যে নগেন্দ্রনাথ বাড়ীতে আসিয়াছেন।

তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। সূর্য্যমুখী তাঁহার সুখের আলয়ের পশ্চাদ্ভাগে গিয়া দেখিলেন যে, খিড়কীদ্বার খোলা রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক গৃহমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। পরে রাত্রি অধিক হইলে তিনি প্রকোষ্ঠের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং উন্মুক্ত দ্বারদেশ দিয়া তাঁহার পরমারাধ্য পতিদেবতাকে শোকাকুল দেখিতে লাগিলেন। স্ত্রীর শোকে স্বামীকে বিমূঢ় দেখিয়া পতি-প্রাণা সূর্য্যমুখী

অত্যন্ত দুঃখবোধ করিলেন। স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য যেমন তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন, অমনি নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর অনুরূপ অবয়ব দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

একাধিকবার মূর্চ্ছাভঙ্গের পর যখন নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীকে চিনিতে পারিলেন, তখন সেই স্বামী-গত-প্রাণা মুগ্ধা স্ত্রী বলিলেন, "উঠ উঠ! আমার জীবন-সর্ব্বস্ব, মাটী ছাড়িয়া উঠিয়া বোস। আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি।"

নগেন্দ্রনাথ গৃহতল হইতে উঠিলেন। তিনি "সূর্য্যমুখীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া, বিনা-বাক্যে অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। তখন উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিয়া কত রোদন করিলেন। কেহ কোন কথা বলিলেন না—কত রোদন করিলেন। রোদনে কি সুখ!"

এই প্রভাত-কালীন শুভ-মুহূর্ত্তে সূর্য্যমুখীর সহিত স্বামীর মিলন হইল। আত্মত্যাগী স্ত্রীর সহিত আত্মত্যাগী পতির মিলন হইল। স্বামীর সুখের জন্য স্ত্রী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, স্বামী আবার সেই স্ত্রীর জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন—ভগবান এই দুই আত্মত্যাগী পবিত্র-হৃদয়কে সম্মিলিত করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিলেন। এরূপ মিলনে নগেন্দ্রের গৃহ পবিত্র হইল—গোবিন্দপুর ধন্য হইল। আর, এরূপ পবিত্র দাম্পত্য-প্রেম ও আত্মত্যাগ-প্রবৃত্তি যদি আমাদের আদর্শ হয়, তাহা হইলে সকল সংসার পবিত্র ও ধন্য হইবে।

প্রেমই সংসারের সুখ, প্রেমই সংসারের জীবন, প্রেম হইতেই সংসারের উন্নতি। এই প্রেমের বর্দ্ধনই অভিপ্রেত, বিনাশ বাঞ্ছনীয় নহে। এই পবিত্র প্রেমের নিদর্শন পাইলে অতি যত্নে, অতি সাবধানে তাহা বর্দ্ধিত

করা উচিত, তাহার পথে বাধা দেওয়া মনুষ্যত্ব নহে। এরূপ স্বর্গীয় নিম্মল প্রেমের সেবা ভগবৎ সেবার ন্যায় পবিত্র। ইহাতে পরস্পরের চিত্ত ভগবানের দিকেই আকৃষ্ট হয়। সেই জন্য এই ব্রহ্মচারী আপন ধর্ম্ম-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পবিত্র প্রেমের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যদি ব্রহ্মচারীর এই উদার নির্ম্মল প্রবৃত্তি আমাদের অভিভাবকদিগের আদর্শ হয়, তাহা হইলে মানবচিত্ত হইতে মোহ বিদূরিত হইবে, সংসার অধিকতর সুখের স্থান হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রেমময়ী স্ত্রী

সংসারে সচরাচর যত প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক শ্রেণীর লোককে দেখিলে মনে হয়, যেন তাহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, অথচ অন্য শ্রেণীর লোকের সারাজীবন দুঃখময়, অনন্ত ক্লেশে জর্জ্জরিত।

এরূপ সুখময় জীবন দেখিলেই মনে হয়, বিধি তাঁহাদের প্রতি চির-প্রসন্ন। যত প্রকার সুখ মানুষ ভাবিতে পারে, সকল রকমই তাহারা পাইয়া থাকে। সুখের প্রতিবন্ধক আপনা হইতেই যেন তাহাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া যায় এবং আত্মীয়-স্বজন যেন নূতন হইয়া তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করে। এরূপ শুভাদৃষ্ট-সম্পন্ন লোক দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। তাহাদের দর্শন চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করে, অন্তর্দ্ধান বিষাদ আনয়ন করে

কমলমণি এইরূপ একটী আনন্দময়ী মূর্ত্তি। এই স্ত্রীলোকের সকল

বাসনা আপনা হইতেই পূর্ণ হইয়াছিল এবং সকল সুখ উপভোগ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। ভগবানের দান তাঁহার আকৃতি অতি সুন্দর ছিল। বড় ঘরে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বড় ঘরে ভাল বরের হাতে তিনি পড়িয়াছিলেন। পিতার গৃহে তাঁহাকে কখনও অর্থাভাব-বশতঃ কষ্টভোগ করিতে হয় নাই এবং পতি-গৃহেও কোন অসচ্ছলতা ছিল না। অধিকন্তু স্বামীর অর্থ স্বাধীনভাবে ব্যবহার করিবার সুযোগ থাকায় তাঁহার কোন সাধই অপূর্ণ থাকিত না।

স্বাভাবিক কোমল ও ভীরু প্রকৃতি-বশতঃ স্ত্রীলোক আদর স্নেহ এবং ভালবাসাই উপভোগ ও সহ্য করিতে পারে, কঠোরতা ও উগ্রভাব সহ্য করিতে পারে না। বিবাদ, বিরোধ, মনোমালিন্য প্রভৃতি অশান্তির মধ্যে পালিত হইলে স্ত্রীলোকের চিত্তের—সম্যক্ বিকাশ হয় না। কোমল স্ত্রী-প্রকৃতি বাধা প্রাপ্ত হইলে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু যে স্ত্রী শান্তিপূর্ণ সংসারে প্রেম-পরায়ণ অভিভাবকদিগের আদর ও বাৎসল্যের মধ্যে প্রতিপালিত হয়, তাহার প্রকৃতি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে থাকে। সে স্ত্রী উত্তরকালে অন্যের প্রতি স্নেহ, ভালবাসা, যত্ন, সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হয় না।

যদি এরূপ স্ত্রীলোক দৈবানুগ্রহ-বশতঃ বা পিতামাতার সদ্বিবেচনা ও আন্তরিক চেষ্টার জন্য অনুরূপ প্রকৃতি ও রূপগুণ-বিশিষ্ট মনোমত স্বামীর হস্তে অর্পিত হন, তাহা হইলে তাঁহার গুণরাশি অধিকতর বৰ্দ্ধিত হয় এবং কালে এইরূপ রমণী রমণীরত্ন হইয়া থাকেন।

কমল প্রথমে পিতার ক্রোড়ে, ভ্রাতার স্নেহে ও নানা আত্মীয় কুটুম্বিনী-দিগের সেবা ও যত্নে পালিত হইয়াছিলেন। সংসারের শান্তি, পিতার উদারতা ও বহু পরিবার পরিজনের একত্র বাস-হইতে তাঁহার চিত্ত ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। পিতার অবর্ত্তমানে সে বালিকা, ভ্রাতা

এবং ভ্রাতৃজায়ার স্নেহ ও আদরে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে কমল যাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সরল, উদার, স্নেহশীল ও প্রেমান্বিত ছিলেন। সুতরাং এই সকল সদ্‌গুণ কমল জীবনের প্রথমাবস্থা হইতেই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কমলমণি শৈশব হইতেই সকলের নির্ম্মল সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ সেবা পাইয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার প্রকৃতি প্রেমপূর্ণ ও সেবাপরায়ণ হইয়াছিল। কখনও কাহারও কুটিলতা দেখিয়া কমলকে ক্ষুব্ধ হইতে হয় নাই, কখনও কাহারও বিশ্বাস-ঘাতকতা দেখিতে হয় নাই এবং কাহারও প্রতি বিশ্বাস-বশতঃ কোনও কার্য্য করিয়া তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হয় নাই। এই জন্য কমল সংসারকে মহৎ, পবিত্র, কর্ম্মময় স্থান বলিয়া মনে করিতেন, মানুষকে বিশ্বাস করিতে পারিতেন এবং মানুষ যে হীন নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি সম্পন্ন হইতে পারে, এ ধারণা করিতে পারিতেন না।

প্রথম-জীবনে সংসারে যিনি অনেক পাইয়া থাকেন, উত্তরকালে তিনি অসঙ্কোচে অনেক দিতে পারেন। এইরূপ ভাগ্যবান্ মানুষ পাওয়া অপেক্ষা দেওয়ায় বেশী সুখ অনুভব করেন। কিন্তু যাহার প্রাপ্তি আশানুরূপ হয় নাই বা যাহার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া যায়, সে কখনও প্রাণ ভরিয়া দিতে পারে না। এরূপ লোক দেওয়ার সুখ অপেক্ষা পাওয়ার সুখ অধিক বলিয়া মনে করে। কমল যথেষ্ট পাইয়াছিলেন—ভগবান্ তাঁহাকে প্রচুর দিয়াছিলেন। সেই জন্য উত্তরকালে কমল প্রতিদানে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই।

কমল পিতৃগৃহে পিতার স্নেহাদর এবং ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার প্রচুর যত্ন পাইয়াছিলেন, কিন্তু কখনও এ সকল ব্যবহারের প্রতিদান দিতে হয় নাই। সেই জন্য যখন প্রতিদানের সময় আসিল, যখন স্নেহ, আদর, ভালবাসা দিয়া এক জনের মুখে আনন্দের হাসি দেখিলেন, তখন তিনি কোনরূপ কৃপণতা না করিয়া প্রাণ ভরিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। যত্ন, সোহাগ ও ভাল-

বাসায় কমল আপন স্বামীকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। ভালবাসা দিয়া যে অপার আনন্দ পাওয়া যায়, সেই আনন্দের আস্বাদ যখন তিনি পাইলেন, তখন তাঁহার ভালবাসা স্বামীকে বেষ্টন করিয়া অন্য আত্মীয় স্বজনের প্রতি ধাবিত হইল এবং পরে মনুষ্য-মাত্রই তাঁহার ভালবাসার পাত্র হইল। তিনি স্নেহ, দয়া ও ভালবাসার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইতেন এবং যেখানে তিনি পদার্পণ করিতেন, সেইখান হইতে বিদ্বেষ ও কুটিলতা এক মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইত।

কমল অপরিচিতা কুন্দকে নিমেষের মধ্যেই আপনার করিয়া লইলেন। যে মানুষকে ভালবাসে না, সে পরকে এত সহজে আপনার করিতে পারে না। কমল কুন্দকে আপনার করিলেন, এবং তাহার ফলে কুন্দ আপন হৃদয়ে অতি উচ্চাসনে কমলকে বসাইল।

নির্ম্মল ভালবাসা, দাম্ভিকতাশূন্য স্নেহ ও নিরহঙ্কার দান সকল সময় তাহার প্রতিদান আনিয়া থাকে। যদি কেহ অহঙ্কার-শূন্য হইয়া নিঃস্বার্থ-ভাবে অন্যকে ভালবাসিতে পারে, তাহা হইলে সেই ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার হৃদয় জয় করিয়া থাকে। এরূপ ভালবাসা, সহানুভূতি স্নেহ জোর করিয়া কাহাকেও গ্রহণ করাইতে হয় না। এ পবিত্র অযাচিত দান মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই গ্রহণ করে এবং দাতাকে মাথায় তুলিয়া রাখিয়া দেয়।

কমল কুন্দকে ভালবাসিয়াছিলেন ও স্নেহ করিতেন। সে ভালবাসা যে কত মধুর ও কিরূপ বিচিত্র, তাহা কমল বুঝিতে পারিতেন না। আপন প্রবৃত্তি-বশতঃ তিনি অন্যকে ভালবাসিতেন, কিন্তু সে ভালবাসা যাহারা পাইত, তাহারাই বুঝিত ইহা কত প্রগাঢ়, কত অপূর্ব্ব, কত আড়ম্বর-শূন্য ও কত নিগূঢ়। এই জন্যই কমলের সংস্পর্শে যে একবার আসিত, সেই তাঁহাকে পরমাত্মীয়া মনে করিত। এই জন্যই যখন কুন্দকে

কমলের বক্ষে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে দেখি, তখন বিস্মিত হই না। এই জন্যই যখন অশান্ত জীবনে শান্তি আনিবার জন্য কমলের সহানুভূতির আশায় সূর্য্যমুখীকে পত্র লিখিতে দেখি বা অতি দুঃখের দিনে যখন সূর্য্যমুখীকে কমলের ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে দেখি, তখন ইহা অস্বাভাবিক মনে করি না। এরূপ অবস্থায় কমলমণিকে দেখিলে, তাঁহাকে দেবী বলিয়া মনে হয়। কমলকে নদীর মত স্নেহময়ী, মেঘের মত সদয় ও স্বার্থলেশ-শূন্য, বৃক্ষের মত আশ্রিত-বৎসল মনে হয় এবং আপনা হইতে আমাদের মস্তক তাঁহার চরণে নত হইয়া আসে।

যাঁহার অন্তরে প্রকৃত প্রেমের বিকাশ হইয়া থাকে, তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি মুখে প্রকাশ পায়, ভাষা মধুময়, শান্তিপ্রদ হইয়া উঠে। এইরূপ লোকের আগমনে দুঃখময় সংসারের দীনতা নষ্ট হয়, সকলই আনন্দময় হয়। সেই জন্য কমলমণির আগমনে নগেন্দ্রের বিষাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসার আনন্দময় হইয়া উঠিত।

কোমল-হৃদয় মেঘের বিদ্যুৎ-বিলাসজনিত রোষপূর্ণ দৃষ্টি যেরূপ ভয়ঙ্কর অথচ নয়ন-রঞ্জন, সেইরূপ প্রেমিকা কমলমণির ক্রোধ ভয়ঙ্কর অথচ চিত্তাকর্ষক। বৈষ্ণবীর গান শুনিয়া কমল বিরক্ত হইলেন। ঈষৎ রুষ্ট হইয়া তিনি বৈষ্ণবীকে ভৎর্সনা করিলেন। সাধারণ গৃহিণীর মত তীব্র দৃঢ়বচনে না বলিয়া কমল বলিলেন, "বৈষ্ণবী দিদি—তোমার মুখে ছাই পড়ুক আর তুমি মর। আর কি গান জান না?" এ ভৎর্সনাই বা কত সুন্দর! সে প্রেমময় হৃদয়খানি যেন মানুষকে পর ভাবিতে পারিত না, মানুষকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারিত না। যখন বৈষ্ণবী ভাল গান গাহিল না, তখন কমল রুষ্ট হইয়া সূর্য্যমুখীকে বলিলেন, "গিন্নীমশাই—তোমার প্রবৃত্তি হয়, তোমার বৈষ্ণবীর গান তুমিই শোন, আমি চলিলাম।" নিমেষের জন্য না দাঁড়াইয়া কমল সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

স্ত্রীলোকের সুখ

স্বামী-প্রেম স্ত্রীলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন এবং ইহাতেই তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা সুখ। স্ত্রীলোক যত ভালবাসিতে পারিবে, সংসারের পাপ ততই কম হইবে, সুখ তত বাড়িবে।

কমলমণি জানিতেন যে, স্বামীর সুখেই স্ত্রীলোকের সুখ। এই সুখ বর্দ্ধিত করিতে হইলে, এই সুখ চিরস্থায়ী করিতে হইলে স্বামীর চিত্তে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ সঞ্চার করিতে হইবে, মন হইতে অবসাদ দূর করিতে হইবে এবং কর্ম্মে উৎসাহ আনিতে হইবে। উৎসাহ এবং উদ্যমই মানুষের উন্নতির একমাত্র উপায়। এই উৎসাহ স্ত্রীর নিকট হইতে পুরুষ যেরূপ পাইতে পারে, অন্য কাহারও নিকট হইতে সেরূপ পাইতে পারে না। এই জন্যই সাধ্বী-স্ত্রী গৃহলক্ষ্মী।

অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে, বিবাহ করিবার পর হইতে পুরুষ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, অথচ বিবাহের পূর্ব্বে সেই মানুষের কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইত না। এরূপ উন্নতি পুরুষের বিবাহের উপর নির্ভর করে না বা বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে সহসা তাহার বুদ্ধির প্রখরতা জন্মে না। এ উন্নতি নির্ভর করে—স্ত্রীর প্রকৃতি ও স্বামীপ্রেমের উপর। যদি কোন পুরুষ স্ত্রীর অনুরোধে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সফলকাম হয়, তাহা হইলে তাহার চিত্তে একটী অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হয়। তখন মোহ অপগত হইয়া স্ত্রীর প্রতি এক নির্ম্মল পবিত্র প্রেমের সঞ্চার হয়, এই প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর প্রতি একটু ভক্তির আবেশ আসে এবং জীবনে উন্নতি করিবার জন্য চেষ্টা হয়। তখন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সেবা, আদর ও ভক্তি এবং স্ত্রীর

প্রতি স্বামীর যত্ন ও ভালবাসা বাড়িতে থাকে। পরস্পরের প্রতি চিত্তের এরূপ অবিরত আকর্ষণ, একের প্রতি অন্যের বদ্ধ-দৃষ্টি, একের সুখের জন্য অন্যের চেষ্টা, একের উন্নতিতে অন্যের আনন্দ, অন্যের আনন্দের জন্য একের অকাতর পরিশ্রম, পাপে লজ্জা ও সাধুতায় উৎসাহ—ইহাই বিবাহিত জীবনের সুখ। এই সুখ স্ত্রীর উপর নির্ভর করে এবং ইচ্ছা করিলে স্ত্রী স্বামীর চিত্তে এই আনন্দ উৎপাদন করিতে পারে। এই সুখের আস্বাদ পাইলে কাহারও বিবাহিত জীবনে অবসাদ আসিতে পারে না। স্বামী স্ত্রীকে কর্ত্তব্যের বিঘ্ন এবং উৎসাহের অন্তরায় বলিয়া মনে করিতে পারে না। এরূপ স্ত্রী সংসারে দুর্ল্লভ ও অমূল্য এবং সেই জন্যই পুরুষের বিষাদ ও সংসারের দুঃখ এত অধিক, এত সাধারণ।

"সোণার কমল" ইহা বুঝিতেন। সেইজন্য কমলমণি স্বামীকে আদর, যত্ন, ভালবাসা ও রঙ্গ, রহস্য, প্রণয়ে সর্ব্বদা মুগ্ধ রাখিয়া কর্ত্তব্য ও উন্নতির প্রতি যত্নশীল ও শ্রমোন্মুখ করিয়া রাখিতেন। আর নিজে আনন্দময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই আনন্দময়ীর আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য শ্রীশচন্দ্রের আগ্রহ বাড়িত। তখন তিনি অধিকতর উৎসাহে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন।

সংসারে শান্তি পাইতে হইলে সকলকে বিশ্বাস করিতে হইবে। যদিও সকলকে বিশ্বাস করিলে অনেক সময় অর্থের ক্ষতি হইতে দেখা যায়, তথাপি এই ক্ষতির মধ্যেও একটু শান্তি আছে। এরূপ বিশ্বাস না করিলে জীবনধারণ অতি কষ্টকর হইয়া উঠে। বিশেষতঃ যে একসংসারে, এক-সঙ্গে প্রতিপালিত হইতেছে, এরূপ লোকের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া সংসার করা অতি ক্লেশকর। ইহাতে প্রবৃত্তি হীন হইয়া যায়, জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে।

একজন পরের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিলে যদি চিত্তের এরূপ অবনতি হয়

এবং জীবনের শান্তি নষ্ট হয়, তাহা হইলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস সংসারে যে কিরূপ অশান্তি উৎপাদন করিবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অসন্তোষ, অভিমান, কলহ, সে সংসারের ভূষণ হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকের অবিরত অনুতাপ ও শোক হইতে সে সংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মী-স্বরূপিণী শান্তিময়ী স্ত্রীর এরূপ দুর্ব্বহ জীবন অপেক্ষা মৃত্যু অনেক সুখের। কমলমণির এ অভিজ্ঞতা ছিল। সেইজন্য স্বামীর প্রতি সূর্য্যমুখীর অবিশ্বাসের স্পষ্ট কারণ দেখিয়াও তিনি সূর্য্যমুখীকে লিখিয়াছিলেন, "তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয় প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার—তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।"

সংসারের প্রকৃত সুখ কি তাহা কমল জানিতেন। এ সুখ যে অর্থ হইতে পাওয়া যায় না, এ সুখ যে একজনের প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতির উপর নির্ভর করে না, তাহা কমল বুঝিতেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, স্বামীকে ভালবাসা ও স্বামীর ভালবাসা পাওয়া, শ্রান্তস্বামীর সেবা ও পরিচর্য্যা করা ও প্রতিদানস্বরূপ স্বামীর আদর পাওয়া এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কর্ম্মের আদান-প্রদান থাকাই সংসারের সুখ। সংসারে পুরুষই কেবল সুখ-ভোগ করে এবং স্ত্রী দাসীপণা করিয়া তাহাদের সুখোপকরণ যোগাইয়া দেয়, পুরুষ বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া আনন্দভোগ করে, আর স্ত্রী গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া যত দুঃখভোগ করে—এরূপ চিন্তা কমলমণির মনোমধ্যে কখনও উত্থিত হয় নাই। পুরুষ ঘোর স্বার্থপর এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বিবাহ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে দাসীত্বে নিযুক্ত করে—এরূপ হীনভাব কমলের চিত্ত কখনও কলুষিত করে নাই। কমল বরং পুরুষের অর্থোপার্জ্জনশ্রম সহানুভূতির চক্ষে দেখিতেন। তিনি জানিতেন যে,

পুরুষের জীবনের অনেক সুখ অন্যের উপর নির্ভর করে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে এবং চেষ্টা করিলে স্ত্রীলোক সকল সুখের অধিকারিণী হইতে পারে। কমল বুঝিতেন যে, সংসারে স্ত্রীলোকের অনেক সুখ এবং সে সকল সুখ তিনি ভোগ করিতে পান। সেইজন্য যখন সূর্য্যমুখী স্ত্রীলোকের কোমল-হৃদয়ের অনন্ত জ্বালার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কমল, কোন্ দেশে মেয়ে হ'লে মেরে ফেলে?" তখন কমলমণি উত্তর করিয়াছিলেন, "মেয়ে হ'লেই কি হয়? যার যেমন কপাল, তার তেমন ঘটে।" তাঁহার অন্তরের আনন্দ, সংসারের সুখ এই কয়টী কথা হইতে বেশ প্রকাশ পায়।

যিনি আনন্দময়ী, তাঁহার সংস্পর্শে সকলই আনন্দময় হইয়া উঠে। অতি দুঃখপূর্ণ চিত্ত আনন্দময়ীর আগমনে সুখের আবেশে হাসিয়া উঠে, তাঁহার দৃষ্টির স্নিগ্ধ কিরণ-সম্পাতে সকলই সুখময় হইয়া পড়ে। যাহার দুঃখ অনিবার্য্য এবং যে দুঃখনাশের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না, আনন্দময়ীর কৃপাদৃষ্টিতে যেন তাহাও বিদূরিত হয়। ভগবান স্বয়ং এরূপ আনন্দময়ীর সুখ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করেন।

সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর হইতে কমলের সুখে ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল। কিন্তু যখন কমল শুনিলেন যে, সূর্য্যমুখীর মৃত্যু হইয়াছে, তখন তাঁহার সকল আনন্দ এককালে নষ্ট হইল। আনন্দময়ীর মুখের নির্ম্মল হাসি একেবারে বন্ধ হইল। তাঁহার অন্তর ও বাহির দুঃখে ম্রিয়মাণ হইল। তখন সর্ব্বদুঃখ-বিনাশিনী, বর-প্রদায়িনী জগদম্বার আসন টলিল। তিনিই অনুগ্রহ করিয়া কমলের সুখের জন্য সূর্য্যমুখীকে গৃহে ফিরাইলেন। অভাবনীয় উপায়ে অসাধ্য সাধিত হইল। তখন সেই সুখের সংসারে আবার সুখের উদয় হইল এবং আনন্দময়ীর মুখে জ্যোৎস্নার মত হাসি ফুটিয়া উঠিল।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রকৃতির চাপল্য

প্রকৃতিগত চাপল্য বা রঙ্গ-রহস্যের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ থাকিলে, সে চিত্ত সংযত করা আবশ্যক। চিত্তে দুর্ব্বলতা না থাকিলে প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয় না। যাহার চিত্ত রসিকতাপ্রবণ, রসিকতা বা ব্যঙ্গের অবসর পাইলে সে পাত্রাপাত্র বিচার করে না। যে কোন স্থলে, যে কোন পাত্রে রসিকতা করিয়া আনন্দ বোধ করে। স্ত্রীলোকের প্রকৃতি যদি এরূপ চপল হয় এবং সে যদি কোন পুরুষের সহিত কিছুদিন রহস্য ও রসিকতায় রত থাকে, তাহা হইলে তাহার চিত্ত ক্রমশঃ তাহাতে অনুরক্ত হইয়া যায়। তখন চিত্ত সংযত না করিলে তাহার প্রতি অনুরাগ উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে এবং একজন অন্যের প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়ে।

হীরাদাসী অতি সাবধানে আপন চিত্তভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সর্ব্বদা নিজেকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত রাখিত বলিয়া সহজে কেহ তাহার চিত্ত-সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারিত না। সে যে কিরূপ রঙ্গ রহস্য ভালবাসিত, তাহা তাহার আচরণ হইতে বেশ বুঝা যায়। "হীরা আড়ালে ব'সে গান করে; দাসীতে দাসীতে ঝগড়া বাধাইয়া তামাসা দেখে; পাচিকাকে অন্ধকারে ভয় দেখায়; ছেলেদের বিবাহের আবদার করিতে শিখাইয়া দেয়; কাহাকে নিদ্রিত দেখিলে চূণ-কালি দিয়া সং সাজায়।" বালক-বালিকা ও দাসীমহলে হীরা রঙ্গ রহস্য করিত; পুরুষের সহিত রহস্য করিবার সুযোগ কখনও হয় নাই বলিয়া হীরাকে এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায় নাই। কিন্তু যদি কখনও সে কোন সুযোগ পাইত, তাহা হইলে তাহা অবলম্বন করিতে কোন দ্বিধাবোধ করিত না। এই জন্যই দেখিতে

পাই, নগেন্দ্রবাবুর বাগানের মালী হীরার বাড়ীতে ফুলগাছের চারা লইয়া আসিলে, সে আপনি তামাকু সাজিয়া "কালো চুড়ি-পরা হাতখানিতে হুঁকা ধরিয়া মালীর হাতে দেয়।"

বৈষ্ণবী-বেশে বাবুর বাড়ী গমনাগমন করিবার উদ্দেশ্য জানিবার জন্য যখন হীরাকে দেবেন্দ্রনাথের উপবন-গৃহে সন্ধ্যার সময় একাকী উপস্থিত হইতে দেখি, তখন বুঝিতে পারি, সে স্ত্রীলোক কিরূপ দুঃসাহসসম্পন্না। কিন্তু পরে যখন দেখিতে পাই যে দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হওয়া সত্ত্বেও হীরা পলাইল না এবং মাতাল হাত ধরিলে সে উন্মুক্ত হইবার কোন চেষ্টা করিল না, তখন জানিতে পারি—সে হৃদয় কিরূপ ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য।

মদ্যপের হস্তে ধৃত হওয়া, মুখের কাছে আলো ধরিয়া দেখা, মদের গ্লাস হাতে দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপার যদি হীরা অপমানসূচক মনে করিত, তাহা হইলে সে পরদিন এই লাঞ্ছনার কথা সূর্য্যমুখীকে বলিত এবং তাঁহারই আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া বিপদে পড়িয়াছিল বলিয়া অধিক পুরস্কার চাহিত। মাতালের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সে যে কিরূপ সাহস ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখাইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিয়া সে প্রভুপত্নীর অধিকতর প্রিয় হইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু পরিহাসপ্রিয় হীরা ইহাকে অপমান ও বিপদ বলিয়া মনে করে নাই। বরং সে ইহাকে তাহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ বলিয়া মনে করিয়াছিল।

যখন দেবেন্দ্রনাথ দুইদিন পরে হীরাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, তখন হীরা কোন আপত্তি না করিয়া সুন্দরবেশে সজ্জিত হইয়া একাকী সেই মদ্যপের সম্মুখে উপস্থিত হইল। যখন হীরা দেবেন্দ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল, তখন তাহার অন্তরে এরূপ আশা জাগিয়াছিল যে, হয়ত তাহারই রূপে আকৃষ্ট হইয়া দেবেন্দ্র তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন। প্রাণের সে আবেগ তাহার আনন্দ ও গানে প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু যখন

দেবেন্দ্রবাবু কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন হীরা স্ত্রী-গর্ব্ব-বশতঃ অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল। রোষসহকারে যদিও হীরা দেবেন্দ্রবাবুকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তথাপি তাহার চিত্ত আজ হইতে সেই পুরুষের প্রতি নিবিষ্ট হইয়া রহিল।

কিছুদিনের মধ্যেই হীরার চিত্ত দেবেন্দ্রের প্রতি এরূপ নিবিষ্ট হইল যে, সে আর কুন্দের প্রতি দেবেন্দ্রের অনুরাগ সহ্য করিতে পারিল না। যে স্ত্রী কোন পুরুষকে আপনার করিতে চাহে, সে কখনও তাহাকে অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত দেখিতে পারে না। সেইজন্য যাহাতে এই স্ত্রীর প্রতি তাহার অনুরাগ কমিয়া যায় এবং প্রণয়িণীর সহিত মিলন বন্ধ হয়, তাহার জন্য সে সর্ব্বদা চেষ্টা করে। এই জন্যই যখন কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহত্যাগ করিয়া হীরার নিকট অবস্থান করিতেছিল, তখন হীরা কুন্দকে দেবেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিল না এবং যাহাতে দেবেন্দ্র কুন্দকে কখনও না পান, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। যতই হীরা দেবেন্দ্রনাথের হস্ত হইতে কুন্দকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ততই সে নিজে দেবেন্দ্রের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন দেবেন্দ্রই তাহার একমাত্র চিন্তা হইল, তাহার সহিত মিলনই তাহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হইল।

যখন দেখিবে কোন স্ত্রীলোক চতুরা এবং সাহসী, হাস্য-পরিহাস-প্রিয় এবং রঙ্গ-ব্যঙ্গ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, বেশ-বিন্যাসে যত্নশালিনী এবং বিলাসদ্রব্যের প্রতি অনুরক্তা, সংযমী বলিয়া গর্ব্বিতা অথচ ধর্ম্মজ্ঞানশূন্যা—তখন সে নারী-হৃদয়ের প্রতি বিলাস করিবে না। যতদূর সম্ভব তাহার সাহচর্য্য ত্যাগ করিবে, কারণ এরূপ স্ত্রীলোকের চিত্ত বিচলিত হইতে অধিক সময় দরকার হয় না এবং একবার বিচলিত হইলে আর আত্মসংবরণ করিতে পারে না।

প্রথম দর্শনাবধি দেবেন্দ্রের প্রতি হীরার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। অন্য-পুরুষের চিন্তা বা রূপের ধ্যান যে স্ত্রীলোকের পক্ষে গর্হিত, তাহা হীরা জানিত না বা জানিলেও তজ্জনিত সুখ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইত না। হীরা যতই দেবেন্দ্রের রূপ-চিন্তা করিতে লাগিল, ততই সেই পুরুষের প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া উঠিল। তখন দেবেন্দ্রকে আপনার করিতে হীরার আন্তরিক ইচ্ছা হইল এবং তাঁহার প্রণয়-লাভই হীরার একমাত্র বাসনা হইল। সেইজন্য যখন দেবেন্দ্র কুন্দের অনুসন্ধানে আসিয়া হীরার গৃহে বসিলেন, তখন হীরা স্বাভাবিক প্রণয়াবেগে তাঁহাকে স্বামী মনে করিয়া আত্মসমর্পণ করিল।

মোহবশতঃ হীরা দেবেন্দ্রকে সম্পূর্ণভাবে আত্মদান করিল। কিন্তু যখন সে তাহার নিকট হইতে অনুরূপ অনুরাগ পাইল না, যখন সে দেখিল তাহার প্রণয়ী অন্যাসক্ত, তখন ক্ষুব্ধ হইল এবং প্রতিশোধের জন্য নগেন্দ্রের বাটীতে তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিল। সে লাঞ্ছনা হীরার বক্ষে বাজিল। দেবেন্দ্রের অপমান স্মরণ করিয়া তদ্গতপ্রাণা হীরা অন্তরে দুঃখানুভব করিল। প্রণয়ীর রোষশঙ্কা করিয়া সে স্ত্রীলোক ভীতা হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে দেবেন্দ্রকর্ত্তৃক আহূত হইয়া যখন হীরা তাহার নিকট যাইল, তখন তিনি তাহার প্রতি এরূপ কপট-প্রণয়-লক্ষণ প্রকাশ করিলেন যে, হীরা তাহাতেই প্রতারিত হইয়া মুগ্ধ হইল। তখন দেবেন্দ্রের প্রণয় আন্তরিক, সরল, স্বাভাবিক প্রণয় মনে করিয়া হীরা তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করিল। ধর্ম্মপত্নী স্বামীকে যত ভালবাসা দিয়া থাকে, তত ভালবাসা হীরা দেবেন্দ্রকে দিল। কয়েকদিন মাত্র হীরার সুখে কাটিল।

অবৈধ প্রণয়, নিভৃত মিলন, হীন-চরিত্র ব্যভিচারীর ভালবাসা যে কখনও চির-সুখের হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া

যায়। অথচ স্ত্রী-পুরুষ অনেক সময় এরূপভাবে মিলিত হইয়া থাকে। সংযমের অভাবই ইহার কারণ। এরূপ মিলনে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই সমভাবে দোষী, সমভাবে ঘৃণিত। কিন্তু এরূপ কার্য্যের প্রতিফলস্বরূপ স্ত্রীলোককে যত অধিক নির্যাতন ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, পুরুষকে তত করিতে হয় না। তাহার কারণ স্ত্রীলোকের সরল, অকপট হৃদয় এবং পুরুষের স্বার্থপর, কুটিল, কঠোর প্রকৃতি। এই কঠোর প্রকৃতি-বশতঃ দেবেন্দ্রনাথ প্রতিশোধ লইবার জন্য হীরার সর্ব্বনাশ-সাধন করিলেন এবং পরে কুটিলতার জন্য হীরার ভাবী দুর্দ্দশার চিন্তামাত্র না করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কপট-প্রণয়-বচনে প্রতারিত করিয়া দেবেন্দ্রনাথ প্রকৃত প্রণয়শালিনী হীরার অনন্ত দুর্দ্দশার কারণ হইলেন। এইরূপে প্রকৃত প্রণয়ের লাঞ্ছনা করিয়া দেবেন্দ্রনাথ যে মহাপাপ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ইহ-জীবনে তাঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অবৈধ প্রণয় দুঃখের কারণ

সকল জীবেরই কতকগুলি মূল ধর্ম্ম আছে। সে ধর্ম্মের বশীভূত হওয়াই স্বাভাবিক; তাহার—বিরুদ্ধাচরণ কৃত্রিমতামূলক। অবোধ জীব এই ধর্ম্মের অধীনস্থ হইয়া সকল সময় কার্য্য করে, কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে সময়ে সময়ে জীবধর্ম্মের অধীন না হইয়া বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকে। এই ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ যতদিন কার্য্য করে, ততদিন সে তাহার প্রভাব বুঝিতে পারে না। কিন্তু একবার বিরোধ হইলে দেখা যায় যে, তাহার শক্তি অসীম, দুর্দ্দমনীয়।

মানব-চিত্তে এইরূপ একটি মূলধর্ম্ম থাকার জন্য পুরুষ কোন একটি বিশেষ বয়সে স্ত্রীলোকের সহিত মিলিত হইতে চাহে এবং স্ত্রীলোকও পুরুষের সাহচর্য্য বাসনা করে। সকলেই যে একই বয়সে এরূপ একটি অভাব অনুভব করে তাহা নহে। জন্মগত প্রকৃতি, শিক্ষা ও সদসৎ সঙ্গীর উপর ইহা নির্ভর করে। প্রত্যেক মানুষের এমন একটি সময় আসে, যখন তাহার চিত্ত আপনার ভিতর থাকিতে সুখ-বোধ করে না। তখন সে সর্ব্বদা আপনার চিত্ত অন্যকে দিবার এবং অন্যের চিত্ত নিজের মধ্যে আনিবার ইচ্ছা করে। যতদিন প্রাণের বিনিময় না হয়, ততদিন কেহ সন্তুষ্ট হইয়া কালযাপন করিতে পারে না। সকল সুখের মধ্যেও কি যেন একটা দারুণ অভাব অনুভব করিয়া সে সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে।

সভ্য-সমাজে বিবাহ-প্রথা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে চিত্তের আদানপ্রদানের সুযোগ ঘটাইয়া দেয়। যদি কোন পুরুষ বা স্ত্রী বিবাহ না করে, তাহা হইলে তাহাকে অন্তরের সহিত নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিতে হয়। জীবধর্ম্মবশতঃ তাহার চিত্ত অন্যের সহিত মিলিত হইতে চাহে অথচ সে আপনাকে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া স্বতন্ত্র থাকিবার চেষ্টা করে। স্বভাবের সহিত এই সংগ্রামে বিজয়লাভ করিতে হইলে সকল সুখাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হইবে। যে মানুষ স্বাভাবিক বৃত্তি দমন করিয়া আপন শরীর ও মনের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, সেই প্রকৃত বীর, মহৎ।

গতানুগতিকভাবে কার্য্য করাই সাধারণের প্রকৃতি। এই প্রকৃতির জন্য প্রায় সকল লোকই বিবাহ করিয়া সংসার করে, অন্যভাবে জীবন-যাপন করিবার চিন্তামাত্রও করে না। যাহারা বিবাহ করে এবং অন্যকে ভালবাসে, তাহারাও সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না। ভালবাসিলেও দুঃখ পাইতে হয়। কিন্তু মানব-প্রকৃতির বিশেষত্ব এই যে ভালবাসার দুঃখ ভোগ

করিতে না পাইলেও মানুষ দুঃখ অনুভব করে। এই দুঃখের শান্তির জন্য একজন অন্যকে ভালবাসে। এই ভালবাসার সহিত যদি প্রকৃত প্রেম সঞ্চারিত হয় এবং একজন অন্যের সহিত মিশিয়া একপ্রাণ হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সে দম্পতী-জীবনের সুখের সীমা থাকে না। আর যদি এরূপ মিলনে প্রেম সঞ্চারিত না হয় এবং পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিতে না পারে, তাহা হইলে দম্পতী-জীবনে মর্ম্মান্তিক দুঃখের সূচনা হয়। এই মরণাধিক যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করে না বলিয়াই একজনকে সহসা অন্যের প্রেমে মুগ্ধ হইতে দেখা যায়। অথচ এই প্রকার অবিচারিত প্রণয়ের ফল যে কিরূপ বিষময়, তাহা কাহারও অবিদিত নহে।

যদি কোন স্ত্রীলোক দুর্ভাগ্যবশতঃ বালবিধবা হয়, তাহা হইলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক বাসনাগুলি তাহার চিত্তে উদিত হইতে থাকে। যখন সে আপনার চিত্ত পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারে, যদি তখন সে এই দুরদৃষ্টকে আপন কর্ম্মফল মনে করে এবং পরলোকে পতির সহিত মিলিত হইবার কামনা করিয়া শরীর ও মনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সেবা ও ধর্ম্মকর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে শারীর-ধর্ম্ম দমন করিতে পারে। কিন্তু যদি কোন বালবিধবার এরূপ প্রবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে জীবধর্ম্ম-প্রভাবে সে অন্তরে জর্জ্জরিত হইতে থাকে, কিন্তু বাহিরে চিত্ত সংযত রাখে। যাহার এ সংযম-প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত নাই, সে যতদিন বাসনা পরিতৃপ্তির সুযোগ না ঘটে ততদিন কোনরূপে মনোভাব প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে, কিন্তু একবার সুযোগ ঘটিলে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। তখন বিবেক ও সৎপ্রবৃত্তির নিষেধ সত্ত্বেও সে বাসনা চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

হীরার অসংযত চিত্তে এইরূপই পরিবর্ত্তন ঘটিল। বালবিধবা হীরা যখন জীবধর্ম্মের প্রভাব বুঝিতে পারিল, তখন সর্ব্বদা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া আপন চিত্ত দমন করিবার চেষ্টা করিল না। বরং সংসার-সুখের চিন্তা

করিয়া, হাস্য-পরিহাসে নিযুক্ত থাকিয়া, শারীরিক সুখের আকাঙ্ক্ষা করিয়া অন্তরে বাসনা জাগ্রত করিয়া রাখিল। সেইজন্য, যখন হীরা দেবেন্দ্রনাথকে প্রথম দেখিল, যখন দেবেন্দ্রনাথ তাহার হাত ধরিলেন, যখন সে স্বাধীনভাবে সেই পুরুষের সম্মুখে বসিল, তখন তাহার ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হীরা আপন উদ্দেশ্য ভুলিল। তখন সেই পুরুষের রূপ তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিল। জীবধর্ম্মের প্রভাবে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইল। এরূপ পুরুষের সাহচর্য্য লাভ করিলে তাহার অন্তরের ব্যথার শান্তি হইতে পারে বোধ হইল। তখন এই নষ্টচরিত্র ব্যক্তির সহিত মিলন হীরার বাঞ্ছনীয় বোধ হইল।

স্বাভাবিক প্রণয়াবেগে যদি কাহারও চিত্তে ভালবাসার বীজ নিহিত হয়, তাহা হইলে প্রথমাবস্থায় তাহার বিনাশ সম্ভব। কিন্তু একবার অঙ্কুরিত হইলে আর বিনষ্ট করিতে পারা যায় না। যখন দেবেন্দ্রের প্রতি ভালবাসা জন্মিল, তখন সে ভালবাসা সমূলে নষ্ট করিবার চেষ্টা হীরা করিল না। দেবেন্দ্রের নীচ-কার্য্য স্মরণ করিয়া, পরস্ত্রীর হস্তধারণ করা অভদ্রোচিত মনে করিয়া হীরা সেই মাতালকে ঘৃণার চক্ষে দেখিল না। আজ দেবেন্দ্রের চিন্তাকে সাদরে হৃদয়ে স্থান দিল বলিয়াই হীরা অল্পদিন পরে তাহার কুটিরাগত দেবেন্দ্রনাথকে সাদরে বসিতে দিয়াছিল এবং সেই পুরুষকে স্বামী মনে করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

স্বাভাবিক প্রণয়-বশতঃ হীরা দেবেন্দ্রকে স্বামী মনে করিয়া আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু যখন তাহার মনে হইল যে দেবেন্দ্র তাহার ভালবাসা অগ্রাহ্য করিতে পারেন বা কিছুদিনের জন্য ভালবাসিয়া পরে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন, তখন সে দৃঢ়তা অবলম্বন করিল। কিন্তু হীরার প্রেমপূর্ণ হৃদয় প্রণয়ীর সম্মুখে অধিককাল দৃঢ় থাকিতে পারিল না। সেইজন্য সে কামিনী অচিরে আপন মনোভাব অতি সরল স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিল,

"প্রভু, আমি আপনার রূপ-গুণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। কিন্তু আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি আপনাকে দেখিলেই সুখী হই।......আমার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, ধর্ম্মে ভক্তি নাই—আমি আপনার ভালবাসার তুলনায় কলঙ্ককে তৃণজ্ঞান করি। কিন্তু আপনি ভালবাসেন না—সেখানে কি সুখের জন্য কলঙ্ক কিনিব? কিসের লোভে আমার গৌরব ছাড়িব? এমন স্থানে কেন আমি আপনার বাঁদী হইব? কিন্তু যেদিন আপনি আমাকে ভালবাসিবেন, সেইদিন আপনার দাসী হইয়া চরণ-সেবা করিব।"

হীরা বুঝিত যে পরপুরুষের প্রতি এরূপ গোপনে আত্মদান করিলে কলঙ্ক অর্জ্জন করিতে হয়। ইহাতে স্ত্রীলোকের গৌরব নষ্ট হয়, অথচ প্রণয়ীর প্রকৃত ভালবাসা না পাইলে কোন সুখলাভ হয় না। সেইজন্য যখন হীরা বুঝিতে পারিল যে তাহার প্রতি দেবেন্দ্রের কোন অনুরাগ নাই, তখন সে আপন ভালবাসা দমন করিবার চেষ্টা করিল। সর্ব্বদা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অন্যমনস্ক থাকিতে পারিলে প্রণয়চিন্তা ভুলিতে পারিবে আশা করিয়া হীরা পুনরায় নগেন্দ্রবাবুর গৃহে চাকরী লইল।

চিন্তাগ্নি কাহারও চিত্তে প্রবেশ করিলে তাহাকে অন্তরে দগ্ধ করিতে থাকে। তখন চেষ্টা করিয়া মনোভাব প্রচ্ছন্ন রাখিলেও, কার্য্য হইতে তাহা প্রকাশ পায়। কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, একাকিনী অবস্থান করিয়া হীরা দেবেন্দ্রকে ভুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনরূপেই চিত্ত স্থির করিতে পারিল না। তাহার অন্তর সেই পুরুষের প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই যখন সে জানিতে পারিল যে, দেবেন্দ্র কুন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার প্রভুর উদ্যান-মধ্যে আসিয়াছেন, তখন সে দুঃখে অধীরা হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিল।

দেবেন্দ্রের এইরূপ অনুরাগ-বিহীন চিত্ত-দর্শনে ব্যথিত হইয়া হীরা তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইল। কিন্তু পরে আপন প্রিয়তমের লাঞ্ছনা

স্মরণ করিয়া দুঃখিত হইল। প্রকৃত অনুরাগ জন্মিলে একজন অন্যের সুখ-দুঃখে আন্তরিক সুখ বা দুঃখ অনুভব করে।, দেবেন্দ্রের প্রতি হীরার অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মিয়াছিল বলিয়াই সে তাহাকে অপমানিত করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অধর্ম্মের প্রতিফল

এ সংসারে যাহারা কোনরূপ বিচার করিয়া কার্য্য করে না, ভাবী ফলাফল গণনা করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হয় না, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এরূপ লোককে বিপদগ্রস্ত ও বিড়ম্বিত হইতে দেখা যায়। ভবিষ্যৎ বিচার না করিয়া স্বাভাবিক জীবন-স্রোতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে কখনও সুখ এবং কখনও দুঃখ পাইতে হয়। কিন্তু যে ভবিষ্যৎ বিচার করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে, সে জীবনে উপভোগ করিবার অবসর অতি অল্পই পায়। এরূপ প্রকৃতি-সম্পন্ন লোককে দুঃখের তীব্র যাতনা সহ্য করিতে হয় না। পূর্ব্ব হইতেই যত্ন করিয়া দুঃখের পথ হইতে সে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহাতেও যদি দুঃখে পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে অদৃষ্টের অখণ্ডনীয় ব্যবস্থা মনে করিয়া শান্তিতে দুঃখ ভোগ করে।

সুখ-দুঃখ বিচার করিয়া যে কর্ত্তব্য স্থির করে, সে সংসারের অনেক সুখ উপভোগ করিতে পারে না। অথচ সুখ হইতে এরূপ ভাবে বঞ্চিত

হওয়ার জন্য সে বিশেষ দুঃখিত হয় না। চেষ্টা করিয়া যে এই প্রবৃত্তিকে স্বভাবসিদ্ধ করে, সে সুখভোগ অপেক্ষা সুখত্যাগেই আনন্দ অনুভব করে। এরূপ চরিত্র সংসারমধ্যে অতি বিরল।

সংসারে এরূপ অনেক লোক দেখা যায়, যে প্রকৃত সুখ দুঃখ বিচার করিয়া লোভনীয় বস্তু গ্রহণ বা ত্যাগ করে। কোন সুখভোগ হইতে বিরত থাকিয়া চিত্ত-সংযত করিলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, এরূপ শ্রেণীর লোক তাহার ধারণা করিতে পারে না। বিচারণা সত্ত্বেও এরূপ লোককে সময়ে সময়ে দুঃখভোগ করিতে হয়।

দেবেন্দ্রের অনুরাগ-বিহীন চিত্ত-দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া হীরা তাহার আসক্তি সংযত করিল। কিন্তু প্রলোভন দমন করিয়া স্ত্রী-গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া সে কোন আনন্দ-বোধ করিল না। সেইজন্য যখন তাহার মনে হইল যে দেবেন্দ্র তাহাকে ভালবাসেন এবং তাঁহার সহিত মিলন হইলে সে সুখী হইতে পারে, তখন হীরা আর আত্ম-দমন করিল না। সরল স্বাভাবিক প্রণয়াবেগে হীরা দেবেন্দ্রকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিল।

প্রেম-প্রভাবে হীরার চিত্ত হইতে কুটিলতা নষ্ট হইল, নীচ মন উচ্চ ও পবিত্র হইল। তখন সে সরলা পতিব্রতা স্ত্রীর মত প্রণয়ীকে অকলুষিত প্রেমরাশি দিয়া তাহার প্রতিদান আশা করিল। যখন সে দেবেন্দ্রের আদর ও সোহাগ পাইল, তখন তাহা স্বামীর অকপট, আন্তরিক ভালবাসা মনে করিয়া হীরা মুগ্ধ হইল। যে প্রণয়-সুখ জাগতিক সকল সুখের শ্রেষ্ঠ, তাহা উপভোগ করিয়া হীরা স্বর্গ-সুখভোগ করিল।

স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র-প্রেম অনন্তকাল স্থায়ী হইয়া থাকে এবং দুইটী হৃদয়কে যাবজ্জীবন সংবদ্ধ রাখে। দেবেন্দ্রের প্রতি সঞ্চারিত প্রণয়কে সেইরূপ পবিত্র মনে করিয়া হীরা আশা করিতেছিল যে, তাহারা স্বামী-স্ত্রীর

মত পরস্পরের প্রেমে চিরকাল আবদ্ধ থাকিবে এবং তাহার ভাগ্যে অপরিমিত সুখভোগ ঘটিবে। প্রথমতঃ কিছুদিন তাহার সুখে কাটিল। কিন্তু অচিরেই যখন দেবেন্দ্র তাহার প্রেমে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া কুন্দের প্রতি আসক্তি জানাইল, তখন সে তাহার কপটতা বুঝিতে পারিল। কৃত্রিম প্রণয়-বচনে মুগ্ধ করিয়া পরে প্রতারিত করিতে দেখিয়া, হীরা দেবেন্দ্রকে মহাপাপিষ্ঠ স্থির করিল।

অবলা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার, স্ত্রীলোকের রূপের প্রতি আসক্তি ও ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা, অকৃত্রিম পবিত্র প্রণয়ের অবমাননা দেখিয়া হীরা ক্রোধান্ধ হইল। তাহার নীচ-মনে নীচতা আসিল। তখন দেবেন্দ্রের শঠতা ও কুব্যবহারের জন্য অতি নীচভাবে সে তাহাকে গালি দিল।

যখন দেবেন্দ্র পদাঘাত করিয়া হীরাকে সেই বিলাস-মন্দির হইতে বিদায় করিলেন, তখন সে প্রতিশোধের জন্য প্রস্তুত হইল। দলিত-ফণা ফণিণী আঘাতকারীর রক্তপান করিবার জন্য যেরূপ তাহার সম্মুখে ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়ায়, কলঙ্কিত হীরা প্রতিশোধের জন্য সেইরূপ প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

তখন হীরার প্রতিশোধ-পরায়ণ চিত্তের সম্মুখে দুইটী মনুষ্য-মূর্ত্তি উদিত হইল। একজন দেবেন্দ্রনাথ—যে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া এই দুর্দ্দশা করিয়াছে এবং অন্যজন কুন্দনন্দিনী যাহার রূপপ্রভা দেবেন্দ্রের চিত্ত-হরণ করায় তাহাকে প্রণয়ীর অঙ্ক হইতে বিচ্যুত হইতে হইয়াছে। হীরা এই দুই জনকেই তাহার দুর্দ্দশার কারণ স্থির করিল এবং প্রাণ-সংহারক বিষ সংগ্রহ করিয়া ইহাদের একজনকে মারিবার সঙ্কল্প করিল।

বিষের কৌটা হীরা আপন গৃহে রাখিল না। মনোদুঃখে বিচলিত হইয়া পাছে কোন সময় আপনি সে বিষ খায়, সেই ভয়ে হীরা বিষের কৌটা নগেন্দ্রবাবুর গৃহে আপন বাক্সমধ্যে রাখিল।

যখন হীরা প্রভুগৃহে কার্য্য করিত, তখন কুন্দের সৌন্দর্য্য তাহার মনে ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত করিত। সেইজন্য ঈর্ষান্বিত হইয়া সে যতদূর সম্ভব কুন্দের প্রতি পীড়ন করিতে লাগিল।

সরলা কুন্দ হীরার নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করিত। সেইজন্য হীরা মনে করিল, কুন্দের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার যেমন সুবিধা হইবে, দেবেন্দ্রের প্রতি সেরূপ করিবার তেমন সুযোগ পাওয়া কখনও সম্ভব নহে। সুতরাং, পাপী হীরা দেবেন্দ্রকে ছাড়িয়া কুন্দকেই তাহার লক্ষ্য করিল।

কুন্দের মনঃপীড়া বুঝিয়া হীরা একদিন তাহাকে প্রণয়-নৈরাশ্যের কথা বলিতেছিল। প্রণয়ীর নিকট প্রেমলাভে বঞ্চিত হইলে যে অতি দারুণ যন্ত্রণা পাইতে হয়, তাহা বলিল। আরও বলিল যে, এই অসহ্য যাতনায় মৃত্যুই কেবল শান্তি দিতে পারে এবং নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা আত্মহত্যা অনেক সুখের। এই কথা বলিয়া সে নিজের বাক্স খুলিয়া বিষের কৌটা কুন্দকে দেখাইল এবং কুন্দের সম্মুখে বিষের কৌটা রাখিয়া স্থানান্তরে গেল। হীরা মনে মনে বুঝিয়াছিল যে, স্বামীর প্রেমে বঞ্চিতা কুন্দনন্দিনী বিষ পাইলে প্রাণের শান্তির জন্য নিশ্চয় তাহা ভক্ষণ করিবে।

হীরার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তাহার আনীত বিষ ভক্ষণ করিয়া কুন্দ প্রাণত্যাগ করিল।

কুন্দনন্দিনীর বিষপান ও প্রাণবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে হীরা নগেন্দ্রের ভবন ত্যাগ করিয়া পলাইল। সুখের সংসারে দুঃখের সৃষ্টি করিয়া হীরা—সেই শোচনীয় দৃশ্যের অন্তরালে দাঁড়াইল; কিন্তু এই নিষ্ঠুর হত্যার চিন্তা হইতে হীরা নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিল না। যে পাপ-প্রবৃত্তি ও ভোগ-লিপ্সার জন্য হীরা আপন ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হইয়াছিল, প্রেমলাভে বঞ্চিত হইয়া যে নীচ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির জন্য সে প্রণয়ীর প্রাণ-সংহার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং যে ঈর্ষার জন্য বিনা

দোষে কুন্দনন্দিনীকে হত্যা করিয়াছিল—এই সকল দুষ্প্রবৃত্তির চিন্তা অহরহঃ তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার অনুশোচনা তীব্রতর হইল।

আবার কখনও তাহার চিন্তাক্লিষ্ট চিত্ত শান্তিময় সুখ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া আনন্দের দিনের কথা স্মরণ করিত। কত সুখ-আশা করিয়া দেবেন্দ্রকে ভালবসিয়াছিল, কেমন প্রাণের সহিত প্রাণ বিনিময় করিয়া দুইজনে চিরপ্রেম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, প্রণয়ীর অনন্তকালস্থায়ী ভালবাসা ও সোহাগ আদরের কল্পনা করিয়া কেমন অকাতরে সে আপনার যথাসর্ব্বস্ব দেবেন্দ্রকে সমর্পণ করিয়াছিল—যেমন হীরা মুগ্ধান্তঃকরণে এই সুখের কথা ভাবিত, অমনি প্রণয়-নৈরাশ্য ও অনুতাপের তীব্র কশাঘাত সর্ব্বশরীরে অনুভব করিত। তখন সে নিজেকে পরিত্যক্ত, প্রতারিত, লাঞ্ছিত এবং গৌরববিহীন, ধর্ম্মহীন, কলঙ্কিত দেখিত। যে মাতৃহৃদয়ের স্নেহ, দয়া ও স্বার্থত্যাগের উপর জগতের অস্তিত্ব ও জগদ্বাসীর জীবন নির্ভর করিতেছে, সেই জননীর অনুরূপ মূর্ত্তি ধরিয়াও সে নরহত্যা করিল। তখন হীরা নিজেকে অদ্বিতীয়া পিশাচিনী বলিয়া স্থির করিল।

যতদিন কাহারও চিন্তা এক বিষয়সম্ভূত ও এক রকমের থাকে, ততদিন সে তাহার গভীরতা সহ্য করিতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়-সম্বন্ধে গভীর চিন্তা জন্মিলে চিন্তার প্রগাঢ়তা আর মানুষ সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই চিত্ত-বিকৃতি জন্মায় এবং অচিরেই উন্মাদ হইতে হয়।

দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর হইতেই হীরার চিত্ত-বিকৃতি জন্মিয়াছিল এবং চিন্তার গভীরতা সহ্য করিতে না পারায়, কিছুদিনের মধ্যেই সে উন্মাদিনী হইল। উন্মত্তাবস্থায় হীরা পূর্ব্বকথা অনেকই ভুলিল, কিন্তু তাহার অসীম কষ্টের কারণ দেবেন্দ্রকে ভুলিল না। প্রতিহিংসাগ্নি তখনও তাহার চিত্তমধ্যে জ্বলিতেছিল! সেইজন্য যখন সে

শুনিল যে, দেবেন্দ্র উৎকট রোগগ্রস্ত, তখন সে তাহাকে দেখিতে আসিল। দেবেন্দ্রকে কুৎসিত মরণান্তক রোগে আক্রান্ত দেখিয়া হীরা আনন্দবোধ করিল। তখন সে সেই পাপিষ্ঠের নীচতা ও শঠতার বিষয় স্মরণ করাইয়া বলিল—"এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।"

অন্তিমকালে দেবেন্দ্রের চিত্তে অনন্ত ক্লেশের সৃষ্টি করিয়া, হীরা তাহার প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সৌকুমার্য্য ও কোমলতা

এই জগতে কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তরে বা দুর্গম প্রস্তরময় স্থানে সময়ে সময়ে এরূপ লতা জন্মায়, যাহা মনোহারিত্বে সে স্থান শোভাময় করিয়া রাখে ; কিংবা এরূপ তরু প্রচ্ছন্ন-অবস্থায় থাকে, যাহার পুষ্পোদ্গমে সে স্থান গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠে। প্রথম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ পুষ্প অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু কেহ দেখে, কেহ দেখে না। পরে পূর্ণ বিকশিত হইলে, যখন তাহার রূপপ্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, তখন দর্শক তাহাতে আকৃষ্ট হয়। রূপে মুগ্ধ হইয়া পুষ্পটিকে তুলিবার জন্য কেহ সেইদিকে অগ্রসর হইতেই যখন তাহার গন্ধ অনুভব করে, তখন তাহার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া সে অধিকতর আগ্রহে তাহাকে আপনার করিবার

চেষ্টা করে, কিন্তু যেমন বৃন্তচ্যুত করিবার জন্য আঘাত করে, তৎক্ষণাৎ হয়ত পুষ্পদলগুলি ঝরিয়া পড়িয়া যায়। তাহা দেখিয়া সে আশাহত হইয়া দাঁড়ায় এবং ছিন্ন করিতে গিয়া এই পবিত্র সুন্দর কুসুমের প্রতি যে আঘাত দিয়াছে, তাহাই স্মরণ করিতে করিতে সে স্থান ত্যাগ করে।

মানবসমাজের মধ্যেও সময়ে সময়ে এরূপ মানুষের আবির্ভাব হয় যে, অনন্ত রূপগুণ সত্ত্বেও প্রথমে কাহারও ভালবাসা ও সহানুভূতি অর্জ্জন করিতে পারে না। কিন্তু যখন তাহার গুণগ্রহণে সমর্থ হইয়া সমাজ তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া অনুরাগ-প্রদর্শনের জন্য অগ্রসর হয়, তখন হয়ত কেহ তাহাকে আর দেখিতে পায় না। স্বজাতি ও আত্মীয় মধ্যে এরূপ অনাদর, অবজ্ঞা, এমন কি, নির্য্যাতন পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হওয়ায় অনেক মহাপুরুষকেও স্বদেশ ত্যাগ করিতে হয়। অথচ তাঁহারাই বিদেশে ভিন্ন-সমাজের মধ্যে আপন গুণের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন।

সাধারণতঃ দুর্ভাগ্যই সৌভাগ্যের সূচনা করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, অনন্তক্লেশে প্রপীড়িত, নির্য্যাতিত, সরল, উদার হৃদয় ইহ-জগতে সুখ-সম্ভোগ করিতে পায় না। এরূপ মানব মৃত্যুর পর সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সহানুভূতি পাইয়া থাকে।

কুন্দনন্দিনী এইরূপই একটী অভাগিনী স্ত্রীলোক। তাহার চিত্তের সরলতা, হৃদয়ের সৌকুমার্য্য ও মাধুর্য্য, মৃদুতা, ধৈর্য্য ও বিনয় সমাজে দুর্ল্লভ। এরূপ অসাধারণ গুণশালিনী হইয়াও কুন্দনন্দিনী সর্ব্বত্রই অনাদৃত ও অবজ্ঞাত হইয়াছিল। এরূপ কোমল নীরব প্রকৃতি সাধারণের ধারণাতীত বলিয়াই জীবিতাবস্থায় কুন্দকে এত যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার মৃত্যু হইল, তখন সকলের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। তখন তাহার সরলতা, কোমলতা ও নম্রতা অনুভব করিয়া সকলেই নগেন্দ্রের সহিত অশ্রু-বিমোচন করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সরলতা ও মৌনপ্রকৃতি

কুন্দনন্দিনীর জন্মের পূর্ব্ব হইতেই তাহার পিতৃ-গৃহ শ্রীভ্রষ্ট হইতেছিল। কিন্তু তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে সংসার একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। আত্মীয়-স্বজন মৃত্যুমুখে পতিত হইল। দুর্ব্বিপাকে তাহাদের অর্থহানি হইল। অবশেষে এই বালিকা এবং তাহার বৃদ্ধ পিতা সেই ধ্বংসোন্মুখ সংসারে অবশিষ্ট রহিলেন।

অতি দুঃখে কষ্টে বালিকা কুন্দ পিতার ক্রোড়ে পালিত হইতেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ অচিরে সে অবলম্বনটুকুও তাহাকে হারাইতে হইল। পিতার মৃত্যুর পর তাহার এমন কোন আত্মীয় রহিল না, যাহার আশ্রয়ে সে থাকিতে পারিত। তখন দৈবানুগ্রহ-লব্ধ দরিদ্র-বৎসল নগেন্দ্রনাথকে অবলম্বন করিয়া কুন্দ দেশত্যাগ করিল।

যখন কুন্দের পিতার মৃত্যু হয়, তখন তাহার বেশ জ্ঞান হইয়াছিল। রুগ্ন পিতার সাহায্যার্থে প্রতিবেশিগণ যেরূপ ব্যবহার করিত তাহার সহিত এই অপরিচিত নগেন্দ্রের ব্যবহারের তুলনা করিবার ক্ষমতা কুন্দের হইয়াছিল। ভিন্ন-দেশাগত নগেন্দ্রনাথের অযাচিত উপকার, মহৎ-প্রকৃতি ও সাধু উদ্দেশ্য দেখিয়া কুন্দ তাঁহাকে দেবপ্রকৃতি-সম্পন্ন বলিয়া মনে করিল। এত রূপ এবং এত গুণ মানুষের থাকিতে পারে,' এ ধারণা করিতে না পারায়, কুন্দ তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিল। তখন তাহার চিত্ত এই নবাগত পুরুষের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

পিতার মৃত্যুর পর রাত্রিশেষে কুন্দ স্বপ্ন দেখিল। নগেন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিলে, কুন্দের কিরূপ অমঙ্গল হইবে এবং নগেন্দ্রনাথ কুন্দের কিরূপ অনিষ্টের কারণ হইবে, তাহা জানিতে পারিয়া কুন্দের পরলোকগতা মাতা স্বপ্ন-মধ্যে আপন কন্যাকে সতর্ক করিলেন এবং নগেন্দ্রের মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন, "বিষধর-বোধে ইঁহাকে ত্যাগ করিও।" কুন্দ সে মূর্ত্তি দেখিল, কিন্তু পূর্ব্বদৃষ্ট কাহারও সহিত সে মূর্ত্তির সাদৃশ্য অনুভব করিতে পারিল না। তখন সে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা করিয়া সন্দিগ্ধ অন্তঃকরণে অবস্থান করিতে লাগিল।

পরদিন যখন নগেন্দ্রনাথ কুন্দের সম্মুখে আসিলেন, তখন যদিও কুন্দ এই পুরুষের আকৃতি স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষমূর্ত্তির অনুরূপ বলিয়া বোধ করিল, তথাপি এরূপ সদাশয় ব্যক্তি যে তাহার কোন অনিষ্টের কারণ হইতে পারে, এ বিশ্বাস তাহার হইল না। প্রত্যক্ষ ও বাস্তব ঘটনা অপ্রাকৃত চিন্তামূলক ঘটনা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য বোধ হইল। তখন কুন্দ নিঃশঙ্কচিত্তে নগেন্দ্রের সহিত যাত্রা করিল।

অকৃত্রিম ভক্তি থাকিলে চিত্তে এক অনাবিল ভালবাসা জন্মায়। প্রকৃতিভেদে এ ভালবাসার প্রকার-ভেদ হইয়া থাকে। চিত্ত নির্ম্মল ও প্রেমপ্রবণ হইলে, এই ভালবাসার দ্বারা ঈশ্বর নির্ব্বিশেষে অন্যে অনুরক্ত হইতে পারে। তখন ভক্তের চক্ষে সকলই পবিত্র বলিয়া মনে হয়, এবং অন্তর শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় হইয়া উঠে।

যখন কোন বর্দ্ধিষ্ঠ সংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন সেই সংসার-বাসীর চিত্ত এক বিচিত্র উপাদানে গঠিত হইতে থাকে। মানুষ দেখিলেই তাহারা তাহার উপর বিশ্বাস করিয়া নির্ভর করিতে চাহে, কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ অনেকের ব্যবহারেই তাহাদিগকে আশাহত হইতে হয়। এইরূপ নৈরাশ্যের সময় যদি তাহারা কোন লোকের সদয়-ব্যবহার পায়, তাহা হইলে এই নীচ,

কপট, ক্রূর-সংসার স্বর্গ বলিয়া মনে করে এবং সেই দয়ালু লোককে ঈশ্বর-প্রেরিত মনুষ্যত্ব-পূর্ণ অসাধারণ স্থির করিয়া শ্রদ্ধাপন্ন হয়। তাহাদের চিত্ত তখন একাধারে ভগবৎ-প্রেমে ও মনুষ্যপ্রেমে সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়।

অবস্থাবিপর্য্যয়ে পবিত্রীকৃত-হৃদয়া কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের আচরণ দেখিয়া প্রথমে মুগ্ধ হইল। কিন্তু যত দিন যাইতেছিল, ততই তাঁহার প্রতি তাহার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গৃহগমনকালে নগেন্দ্র যখন অতি যত্ন ও আদর করিয়া কুন্দকে আপন বজরায় লইয়া যাত্রা করিলেন, তখন সে সকলই অপার্থিব মনে করিল। আপন স্বল্প অভিজ্ঞতার সহিত মানবের আচরণের এরূপ বিভিন্নতা দেখিয়া কুন্দের সরল, নির্ম্মল হৃদয় নগেন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত হইল।

কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের সংসারে আনীতা হইল। অল্পদিন পরেই তারাচরণের সহিত তাহার বিবাহ হইল। তারাচরণের সহিত কিছুদিন বাস করিয়া এবং তাহার সকল ব্যবহার দেখিয়া, কুন্দ নগেন্দ্রের সহিত স্বামীর প্রকৃতির পার্থক্য অনুভব করিল। স্বামীর ব্যবহার সে সকল সময় সহ্য করিতে পারিত না এবং কখনও কখনও কোমলপ্রাণে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিত।

হিন্দু-স্ত্রী যেরূপ অবস্থায় আজন্ম-পালিত হউক না কেন, তাহার যেরূপ প্রকৃতি হউক না কেন, যেরূপ শিক্ষা ও আদর্শ থাক্ না কেন, বিবাহের পরে স্বামী-গৃহে বিভিন্ন অবস্থা ও স্বামীর বিভিন্ন প্রকৃতি ও আদর্শ দেখিলে কিছু দিনের জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু অচিরেই আপন সকল প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া স্বামীতেই আসক্ত হইয়া পড়ে এবং তাঁহারই কার্য্য করিতে আনন্দ-বোধ করে। তখন সেই স্বামীই তাহার নিকট দেবতার মত পূজ্য হইয়া থাকে।

স্বামীর প্রকৃতি আপন আদর্শ অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট হইলেও, কুন্দ কিছু কালের মধ্যে সেই স্বামীতে মুগ্ধ হইতে পারিত এবং অন্তের চিন্তা চিরকালের জন্য ভুলিয়া যাইত। কিন্তু অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে কুন্দ স্বামীর সহিত অধিককাল বাস করিবার অবসর পাইল না। বিবাহের তিন বৎসর পরেই সে বিধবা হইল।

বিধবা হইবার পর কুন্দ নগেন্দ্রের সংসারে আসিল। যে পুরুষের মহানুভবতায় তাহার চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, আবার সেই পুরুষের সম্মুখে তাহাকে আসিতে হইল। নগেন্দ্রের সম্মুখে থাকিয়া কুন্দ অচিরেই আপন স্বামীকে ভুলিল। তখন নগেন্দ্রকে দেখিতে তাহার ভাল লাগিত; তাহার বিষয় চিন্তা করিতে সুখ হইত। আপন মনোভাব হৃদয়মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কুন্দ আনন্দ অনুভব করিত। কিন্তু ধীর-স্বভাব-বশতঃ নিজের চিন্তার বিষয় লইয়া অন্তের সহিত আলোচনা করিত না।

নগেন্দ্রের সংসারে অনেক সমবয়স্কা কিশোরীদিগের মধ্যে থাকিয়া যুবতী কুন্দনন্দিনী কখনও আপনার মনোভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না। সে পাঁচজনের মধ্যে বসিত, কিন্তু অন্য স্ত্রীলোকদিগের মত গল্প করিত না। সুখ-দুঃখমিশ্রিত জীবনের গভীর চিন্তা তাহার প্রকৃতি গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছিল। সেইজন্য সামান্য ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আসক্তি-অনাসক্তি সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইত।

সাধারণ স্ত্রীলোকের মত প্রকৃতি হইলে কুন্দ অল্পভাষিণী না হইয়া বহু-ভাষিণী হইত এবং সুখভোগে অতি স্পৃহা জন্মিত। কিন্তু কুন্দের এরূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

যৌবনের প্রারম্ভে বা অব্যবহিত পরে বিধবা হইলে স্ত্রীলোক সময়ে সময়ে আপন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কথা অন্যকে বলিতে সুখবোধ করে এবং অন্যের সুখের কথা শুনিতে ভালবাসে। কিন্তু কুন্দ নিজের আকাঙ্ক্ষার

কথা কাহাকেও বলিত না এবং কিসে সে সুখী হয়, তাহা কেহই জানিত না। এই ধীর শান্ত-প্রকৃতির জন্য কুন্দ অপরিচিতা বৈষ্ণবীকেও আপন ইচ্ছা স্পষ্ট জানাইতে চাহে নাই। বৈষ্ণবী তাহার মত জিজ্ঞাসা করিলে, সে পার্শ্বস্থিতা সহচরীকে নিম্নস্বরে বলিয়াছিল—"কীর্ত্তন গাহিতে বল না।" যৌবন-সুলভ চাঞ্চল্য ও অধীরতা কুন্দের চিত্তে একেবারেই ছিল না।

অন্তঃপুরমধ্যে যখন সকল স্ত্রীলোক স্বাধীনভাবে বসিয়া আপন আপন ইচ্ছামত গল্প করিতেছিল, তখন কুন্দনন্দিনী কাহারও গল্পে যোগ না দিয়া বা কোন সমবয়স্কা যুবতীর গল্প না শুনিয়া, একটি ছেলেকে ক, খ, শিখাইতেছিল। অন্যের দেখাদেখি কোন কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া কুন্দ বৈষ্ণবীকে গীত নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেয় নাই এবং গীত সমাপ্ত হইলে কোন অভিমত প্রকাশ করে নাই। আপনার বা অন্যের কথা লইয়া সকলের সহিত আলোচনা করিতে ভালবাসিত না বলিয়াই বৈষ্ণবী কুন্দকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা সে কাহাকেও বলে নাই। বিশেষতঃ, যখন সে জানিত যে বৈষ্ণবীর সঙ্গে কোথাও যাইবে না, তখন এ কথা সূর্য্যমুখীকে বলিবার কোন আবশ্যকতা বোধ করে নাই।

গরীব লোক বড় ঘরে আসিয়া সুখভোগের অগাধ অধিকার পাইলে সাধারণতঃ বিলাসী ও ভোগপ্রিয় হইয়া উঠে। কুন্দনন্দিনী যখন নগেন্দ্রের সংসারে আসিল এবং আত্মীয় বলিয়া গণ্য হইল, যখন সে দেখিল তাহার পরিচর্য্যার জন্য দাসী নিযুক্ত হইল, যখন সে আপনাকে গৃহিণীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিল, তখন সে সাধারণ পুরস্ত্রী অপেক্ষা অধিক সুখভোগে প্রবৃত্ত হইতে পারিত। কিন্তু সেরূপ ইচ্ছা তাহার কখনও হয় নাই। বড়-ঘরের স্ত্রীলোকের মত গর্ব্বভরে থাকিতে পারিত না বলিয়াই কুন্দ কখনও দাসীদিগকে শাসনাধীন রাখিতে পারে নাই এবং সেইজন্যই

যখন সে নগেন্দ্রের পরিণীতা স্ত্রী হইয়া সে গৃহে গৃহিণী হইয়াছিল, তখন হীরা দাসী তাহারই উপর কর্ত্তৃত্ব করিত।

এ জগতে কেহ কাহাকেও চিনিবার জন্য চেষ্টা করে না। যে আপনাকে যেরূপভাবে দেখাইয়া দেয়, লোকে সেইরূপ ভাবেই তাহাকে গ্রহণ করে, প্রায় কেহই বিচার করিয়া দেখে না, ইহা সত্য কি না। সেই-জন্য এ সংসারে ধীর-স্থির-গম্ভীর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোককে অত্যন্ত নির্য্যাতিত হইতে হয়। অন্যের কঠোর ব্যবহার ও অত্যাচারের কথা কাহাকেও না বলিয়া নীরবে সহ্য করে বলিয়া সকলে তাহার উপরে প্রাণ ভরিয়া অত্যাচার করে। প্রায় কেহ তাহার মহৎ হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি এরূপ লোকের লাঞ্ছনা ও অন্তর্যাতনা অনুভব করিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঞ্চার হয়। তখন এই উদার ব্যক্তির নিকট সে আপন দুঃখের কথা সময়ে সময়ে প্রকাশ করে এবং তাহারই সহানুভূতি প্রত্যাশা করিয়া নীরবে সকল অবিচার সহ্য করে। এ সংসারে মৌন শান্ত-প্রকৃতির অনন্ত দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সময়ে সময়ে উদার মহৎ-হৃদয়ের সমবেদনায় এ যাতনার ঈষৎ লাঘব হইয়া থাকে।

কুন্দনন্দিনীর ক্লিষ্ট মুখের দিকে প্রায় কেহই চাহিয়া দেখিত না। সে আপন মনোভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না বলিয়া কেহই তাহার হৃদয়-সৌন্দর্য্য ও কোমল-প্রকৃতি অনুভব করিতে পারিত না। সূর্য্যমুখী প্রখর বুদ্ধিশালিনী হইয়াও কুন্দের প্রকৃতি-সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারেন নাই। সেইজন্য যখন তিনি স্বামীর চিত্ত পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলেন, তখন কুন্দকেই ইহার কারণ স্থির করিলেন। সৌন্দর্য্যবশতঃ স্বামীর স্নেহভাগিনী হওয়ায় কুন্দের প্রতি তাঁহার ঈর্ষা হইল এবং সেই ঈর্ষা-বশতঃ হীরার মুখের কথায় বেশী বিশ্বাস করিয়া কুন্দকে চরিত্রহীন স্থির

করিলেন। তখন কর্ত্তৃত্বশালিনী গর্ব্বিতা সূর্য্যমুখী কুন্দকে অন্যের সম্মুখে নিঃসঙ্কোচে অপমানিত করিলেন এবং তাহার গৃহ ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। যাহার চরিত্র-সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই, আজ সহসা তাহাকে কলঙ্কিনী বলিয়া অপমানিত করিতে সূর্য্যমুখী কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিলেন না। কুন্দনন্দিনী এ অপমান নীরবে সহ্য করিল—এরূপ অপবাদের যে প্রতিকার আবশ্যক, তাহা তাহার মনে হইল না। গৃহিণীর আদেশমত সে সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিল।

সেই সংসারে কেবল কমলমণি কুন্দকে চিনিয়াছিলেন। সেইজন্য কুন্দের অপমানে দুঃখিতা হইয়া, তিনি তাহার মর্ম্মান্তিক দুঃখে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন এবং কুন্দ গৃহত্যাগ করিলে তাহাকে ফিরাইবার জন্য তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ হইয়াছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রণয়ের পবিত্রতা

সাধারণতঃ স্ত্রীলোক যৌবনের প্রারম্ভেই জাগতিক প্রণয় ও তাহাতে সৌন্দর্য্যের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু না কিছু বুঝিয়া থাকে এবং যৌবনকালে সে সৌন্দর্য্য পূর্ণ বিকশিত হইলে, এ জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়। তখন স্ত্রীলোক আপন সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে এবং প্রণয়ীর চিত্ত আকৃষ্ট করিবার ও তাহাকে রূপমুগ্ধ রাখিবার সর্ব্বদা চেষ্টা করে। এরূপ স্ত্রীলোক প্রণয়কে পণ্য-দ্রব্য স্থির করিয়া যতদূর সম্ভব মনোভাব প্রকাশ করে এবং প্রণয়ীর বাহ্যিক প্রেমালাপে সন্তুষ্ট হয়। যদি কোন স্ত্রীলোকের চিত্ত ঈষৎ সমল হয়, কিংবা আপন সৌন্দর্য্য অসাধারণ মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করে, তাহা হইলে সে আপন রূপপ্রভা অন্য পুরুষকেও দেখাইতে ত্রুটি করে না।

কুন্দনন্দিনী সুন্দরী, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য যে অন্য পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে, এ ধারণা তাহার ছিল না। রূপ দেখাইয়া এবং সময়ে সময়ে আপন রমণীয় মূর্ত্তি প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা করিয়া যে একজন পুরুষকে মুগ্ধ করিতে পারা যায়, এরূপ জ্ঞান কুন্দের ছিল না। একজনকে ভালবাসিয়া সুখী হইতে হইলে যে তাহারও ভালবাসা পাইতে হয়, ইহা কুন্দ বুঝিত না; অথচ সে সাধারণ স্ত্রীলোকের মত রূপ ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া ভালবাসিতে জানিত। সেইজন্য কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার ভালবাসা পাইবার জন্য কখনও কোন চেষ্টা করে নাই।

যে ভালবাসা অন্যে জানিতে পারে এবং প্রতিদানের অপেক্ষা করে, তাহা নিম্নস্তরের ভালবাসা।' যাহার ব্যবহার ও কার্য্য হইতে প্রণয়-লক্ষণ প্রকাশ পায়, সে প্রণয়ের ব্যবসায়ী। এরূপ প্রণয় নিম্নস্তরের হইলেও ইহা নিকৃষ্ট নহে। যে প্রণয় হৃদয়ে চাঞ্চল্য না আনিয়া শান্তি আনয়ন করে, যে প্রণয় প্রবৃত্তিকে হীনপথে না লইয়া উৎকৃষ্ট কর্ম্মে ও চিন্তায় নিযুক্ত করে, যে প্রণয় দম্পতি-হৃদয়ে পরস্পরের দর্শনাকাঙ্ক্ষা জন্মায় এবং দর্শন-মাত্রেই আত্মতৃপ্তি সম্পাদন করে, তাহাই পবিত্র নিষ্কলঙ্ক প্রণয়। এরূপ প্রণয় প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা করে না, উপভোগের বাসনা রাখে না।

নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দের যে প্রেম সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা অতি উচ্চস্তরের। নগেন্দ্রের অন্তর এবং বহিঃ-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কুন্দ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে তদ্‌গতপ্রাণা হইয়াছিল। নগেন্দ্রকে দেখিতে, তাহার বিষয় চিন্তা করিতে কুন্দ আনন্দবোধ করিত। সে আনন্দ তাহার নিকট স্বর্গসুখ বলিয়া মনে হইত। সেইজন্য তন্ময় হইয়া কুন্দ সকল সময় অন্তরে অপার আনন্দ ভোগ করিত।

যদি কাহারও প্রকৃত সুখোৎপাদনকারী কোন চিন্তা বা কার্য্য থাকে, তাহা হইলে সে অতি যত্নে সেই চিন্তা বা কার্য্য গোপন রাখিবার চেষ্টা করে। কোন আত্মীয় বন্ধুর নিকট ইহা প্রকাশ করে না। কিন্তু যদি কোন সমচিন্তাপরায়ণ বন্ধু হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া নিভৃতে তাহার নিকট সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, তাহা হইলে সে গোপন মনোভাব আর গোপন রাখিতে পারে না। তখন দুই বন্ধু একপ্রাণ হইয়া একই চিন্তায় মুগ্ধ হইয়া যায়।

কুন্দনন্দিনীর যে অমূল্য সম্পত্তিখানি ছিল, তাহা সে কাহাকেও জানিতে দিত না। যে প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের জন্য সে অনন্তসুখে সুখী ছিল, তাহা অতি যত্নে গোপন রাখিত। সে হৃদয় যে কত মহান্, কত অপার্থিব

তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না। কিন্তু যেদিন কমলমণি কুন্দনন্দিনীর গৃহে গিয়া স্নেহভরে তাহার মস্তক আপন বক্ষের উপর ধরিয়া তাহার হৃদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন কুন্দ আর লুকাইতে পারিল না। চোখের জলে মনের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল। বালিকার ন্যায় অসঙ্কোচে সে যেভাবে কমলের বক্ষমাঝে মুখ রাখিয়া কাঁদিল, তাহা হইতেই তাহার প্রেমের গভীরতা ও হৃদয়ের কোমলতা কমলমণি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিত, কিন্তু তাঁহাকে আপনার করিয়া উপভোগ করিবার বাসনা ছিল না। সেইজন্য যখন কমল তাহাকে বলিলেন যে, নগেন্দ্রের নয়নান্তরালে না যাইলে সে সংসার নষ্ট হইবে, তখন কুন্দ প্রণয়ীর দর্শনাকাঙ্ক্ষাও ত্যাগ করিয়া কমলের সহিত কলিকাতা যাইতে স্বীকৃত হইল। কুন্দ নগেন্দ্রকে যেরূপ ভালবাসিত, তদনুরূপ যদি তাহার ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকিত, তাহা হইলে সে কখনও নগেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত প্রণয় ও বিবাহ-প্রসঙ্গ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত না।

অথচ কুন্দ নগেন্দ্রকে দেখিতে ভালবাসিত। তাঁহাকে দর্শন করিতে পাইলেই সে অনির্ব্বচনীয় সুখবোধ করিত। সে সুখ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবনধারণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। সেইজন্য যখন কুন্দের মনে হইল যে, কিছুদিনের মধ্যেই কমলের সহিত কলিকাতা যাইতে হইবে, তখন নগেন্দ্রের অদর্শন অসহ্য বোধ হইল। কলিকাতা যাইয়া জীবন-ধারণ অপেক্ষা নগেন্দ্রের সম্মুখে থাকিতে থাকিতে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া সুখকর বোধ হওয়ায়, সে আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইল।

সন্ধ্যার সময় কুন্দ গৃহসংলগ্ন উদ্যানে আসিয়া পুষ্করিণীর তীরে বসিল। সেখানে বসিয়া কুন্দ আপন জীবনব্যাপী দুঃখের আলোচনা করিতে লাগিল। তাহার অতৃপ্ত প্রেমরাশি ও অবলম্বনশূন্য অন্তরের ভারে সে

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। তখন সে মৃত্যু ভিন্ন এই অসীম দুঃখ নিবারণের অন্য উপায় চিন্তা করিতে পারিল না। মৃত্যু-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সরল অন্তরে এক নূতন সুখের আশা উদিত হইল। তাহার মনে হইল যে, মরিলে সে নক্ষত্র হইতে পারিবে। সুতরাং আকাশ হইতে নির্নিমেষনেত্রে সে তাহার প্রিয়পুরুষ নগেন্দ্রনাথকে দেখিতে পারিবে মনে করিয়া উৎসাহিত হইল। তাহারই ক্ষীণ আলোকতলে নগেন্দ্র পরিভ্রমণ করিবেন এবং শান্তিতে রাত্রিযাপন করিবেন মনে করিয়া কুন্দ মৃত্যুচিন্তায় আনন্দ অনুভব করিল।

যখন কুন্দ মৃত্যুকে অবলম্বন করাই স্থির করিল, তখন তাহার চিত্ত হইতে ভয় ও সঙ্কোচ দূর হইল। যে আকাঙ্ক্ষা তাহার জীবনে পূর্ণ হইবার নহে জানিয়া ব্যথিত হইত, আজ কুন্দ তাহা চরিতার্থ করিয়া সুখভোগ করিল। কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করিয়া কুন্দ তাহা হইতে নগেন্দ্রকে সকল সময় দেখিতে লাগিল। সে স্থান জনশূন্য দেখিয়া কুন্দ প্রাণ ভরিয়া তাহার প্রিয়তমের নাম করিল এবং একবার তাঁহাকে আপনার মনে করিয়া সাদরে বলিল, "আমার নগেন্দ্র।" স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া কুন্দ তাহার প্রতি নগেন্দ্রের অনুরাগের কথা ভাবিল। পরস্পরের প্রতি পরস্পর আকৃষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া যখন সে আনন্দিত হইল, তখন কলিকাতা যাইতে হইবে মনে হওয়ায় সহসা তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তখন পিতৃগৃহ-দৃষ্ট স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তাহার মনে পড়িল।

নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দের প্রণয়-সম্ভোগ প্রবৃত্তি-সম্ভূত ছিল না। যদি তাহাতে পার্থিব ভাবের আধিক্য থাকিত, তাহা হইলে যখন সে বিনাদোষে লাঞ্ছিত হইয়া নগেন্দ্রের গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তখন গৃহস্বামীর প্রতি বিরাগ জন্মিতে পারিত। অথবা যদি কুন্দের প্রণয় নিকৃষ্ট হইত, তাহা হইলে নগেন্দ্রের চিত্ত তাহার প্রতি আসক্ত কি না জানিবার বাসনা হইত।

কুন্দের প্রকৃতি যদি সাধারণ স্ত্রীলোকের মত নীচ ও খল হইত, তাহা হইলে নগেন্দ্রকে অনুরক্ত দেখিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিত এবং পরে সূর্য্যমুখীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইত। কিন্তু এরূপ ইচ্ছা কুন্দের একদিনও হয় নাই।

যখন কুন্দ গভীর নিশীথে নগেন্দ্রের আলয় ত্যাগ করিল, তখনও তাহার চিত্ত তাঁহার প্রতি সমভাবে নিবিষ্ট ছিল। সেই অনুরাগবশতঃ কুন্দ গৃহসংলগ্ন উদ্যানমধ্যে থাকিয়া তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিল এবং একবার বাতায়নপথে দেখিতেও পাইল। যখন নগেন্দ্র অদৃশ্য হইলেন, তখন কুন্দ উদ্যান ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিল। কিন্তু ভীরু কুন্দ কতদূর যাইতে পারে? রাত্রির অন্ধকার এবং মেঘবৃষ্টির মধ্যে প্রতিপদক্ষেপ তাহার সুকুমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার করিতেছিল, নগেন্দ্রের চিন্তা তাহার চরণের গতিশক্তি লোপ করিতেছিল। তখন প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে পথবাহন অসম্ভব মনে করিয়া কুন্দ পথিপার্শ্বস্থ গৃহস্থের কুটিরদ্বারে আশ্রয় লইল। যখন কুন্দ তথায় দাঁড়াইয়াছিল, তখন সে জানিত না যে, সে কুটীর হীরার। কিন্তু যখন সে গৃহ হইতে হীরাকে বাহির হইতে দেখিল এবং যখন হীরা তাহাকে সে গৃহে দুইদিন থাকিবার জন্য বলিল, তখন কুন্দ স্বস্তি বোধ করিল। ভীতি-পূর্ণ স্বভাব-বশতঃ কুন্দ সে গৃহ ত্যাগ করিবার চিন্তামাত্রও করিতে পারিল না।

মনোদুঃখে কুন্দ দুই চারিদিন হীরার গৃহে রহিল। সে যত প্রকার দুঃখের চিন্তা করিত, তাহার মধ্যে নগেন্দ্রের অদর্শন-জনিত দুঃখই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হইত। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই সে দুঃখ গাঢ়তর হইতেছিল। পরিশেষে কুন্দ সে দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিল না। নগেন্দ্রকে দেখিবার ইচ্ছা এরূপ তীব্র হইল যে, লাঞ্ছনা ও অপমান তাহার তুলনায় সে অতি তুচ্ছ মনে করিল। তখন কুন্দ নগেন্দ্রকে

একবার দেখিবার জন্য রাত্রি-শেষে হীরার অজ্ঞাতসারে দত্ত-গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

যেখানে চিত্তে এরূপ আগ্রহ ও একাগ্রতা, যেখানে প্রিয়জনের দর্শনের জন্য হৃদয় লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত, যেখানে একের চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া আপনাকে ভুলিতে হয়—সেখানে হৃদয় কখনও নীচ ভোগাসক্তিপূর্ণ হইতে পারে না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অতৃপ্ত প্রণয় ও নিষ্কৃতি

নগেন্দ্রকে দেখিতে পাইবার আশায় কুন্দ উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। পুষ্প-বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া তাহার চক্ষু দুইটি নগেন্দ্রের অনুসন্ধান করিতেছিল, এমন সময় সূর্য্যমুখী তাহাকে দেখিতে পাইলেন। তখন কুন্দ অপমান আশঙ্কা করিয়া ভীতা হইল। সূর্য্যমুখী আদর করিয়া তাহার হাত ধরিলেন এবং সযত্নে তাহাকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন। এইরূপে কুন্দ নগেন্দ্রের ভবনে ফিরিয়া আসিল।

কুন্দকে পাইয়া সূর্য্যমুখী আনন্দ-বোধ করিলেন্ এবং ভগবান তাঁহার সঙ্কল্প পূর্ণ করিবার উপায় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার চিত্ত কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইল। যতদিন না তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ততদিন যাহাতে তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ থাকে, সেইজন্য তিনি ভগবানের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে কুন্দকে বিবাহ করিবার জন্য সূর্য্যমুখী স্বামীকে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহাকে সম্মত করিয়া কুন্দকেও সে সম্বন্ধে জানাইলেন।

কুন্দের কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না। সরলা কুন্দ আপনার ভাল মন্দ কিছুই বুঝিত না। সুতরাং যখন সূর্য্যমুখী কুন্দের প্রতি স্বামীর প্রগাঢ় অনুরাগ, তাহার অনুপস্থিতিকালে স্বামীর চিত্তের অবসন্নতা ও তাহার অনুসন্ধানের জন্য তাঁহার গৃহত্যাগের উদ্যোগের কথা বলিলেন—যখন তিনি বলিলেন যে তাহার প্রতি চিত্ত ধাবিত হওয়া অবধি তাঁহার স্বামী অতি কষ্টেই দিনযাপন করিতেছেন এবং তাহাকে লাভ করিতে না পারিলে তিনি সংসারের সকল সুখ হইতে বঞ্চিত হইবেন, তখন কুন্দ বিবাহ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। যখন সূর্য্যমুখী কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের অনুরাগ ও তাঁহার প্রতি কুন্দের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির কথা জানাইয়া বলিয়াছিলেন যে, এরূপ মিলন বাঞ্ছনীয় এবং উভয় পক্ষের হিতকর ও সুখকর, তখন কুন্দ কোন আপত্তি করিতে পারিল না। যখন সূর্য্যমুখী স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়-প্রবৃত্তির কথা বলিয়া বৈধব্য-জীবনের আশঙ্কার বিষয় জানাইলেন এবং এইরূপ শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম্ম-বিবাহই যে স্ত্রী-গৌরব রক্ষা করিয়া থাকে বলিলেন, তখন কুন্দ নগেন্দ্রকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল।

বিবাহ সমাজ-বন্ধন ও সামাজিক শৃঙ্খলা-স্থাপনের পন্থা হইলেও প্রণয়-রাজ্যে ইহা একটি নিকৃষ্ট বৃত্তি। বিবাহ ও স্বামী-স্ত্রীর মিলন পরস্পরের মধ্যে অনুরাগ-সঞ্চার করে, কিন্তু অনুরাগের প্রসার নষ্ট করে। বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর অবাধ-মিলনের সুযোগ ঘটাইয়া সৌন্দর্য্যানুভব-শক্তি নষ্ট করে। বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে, দুঃখের সৃষ্টি করে এবং সময়ে সময়ে অবসাদ আনয়ন করে। বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর চিত্ত পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া ভালবাসা জন্মায়, কিন্তু জীব-ধর্ম্মের প্রভাব-বশতঃ সে ভালবাসা উন্নতিলাভ করিয়া পবিত্র অনাবিল প্রেমে পরিণত হইতে

পারে না। বিবাহ অবাধ-মিলন প্রকৃত প্রেমের বিস্তার প্রতিরোধ করে এবং বিরহ প্রেমের প্রতিষ্ঠা ও চিত্তের পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারে।

কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ হইল। যে নগেন্দ্রনাথ কুন্দের অভাবে সংসার সুখলেশশূন্য বোধ করিতেছিলেন এবং যাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য তিনি প্রায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন, বিবাহের পর তিনি সেই বাঞ্ছিতা কামিনীর সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পাইলেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই, নগেন্দ্রনাথ অসীম আনন্দ অনুভব করিলেন।

নগেন্দ্রের সহিত বিবাহ হওয়ায় কুন্দও সুখী হইল। যে কুন্দ নগেন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমের জন্য নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়াছিল, সেই প্রিয়-পুরুষ আজ তাহার আপনার হইয়াছে বলিয়া অসীম আনন্দ বোধ করিল। যে সুখভোগ করিবার আশা তাহার কখনও হয় নাই, বিবাহের পর সে সেই সকল সুখের আশা করিল। আকাঙ্ক্ষা ও কামনা তাহার নির্ম্মল-চিত্তে কালিমা উৎপাদন করিল।

কুন্দের সহিত কিছুদিন থাকিয়াই নগেন্দ্রের রূপানুভূতি নষ্ট হইল। তখন কুন্দের প্রতি অনুরাগ সীমাবদ্ধ হইল এবং সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর বিচ্ছেদ ও বিরহ তাঁহার প্রেম সূর্য্যমুখীর দিকে প্রসারিত করিল। তখন নগেন্দ্রনাথ কুন্দের প্রতি বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া, সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানে গৃহত্যাগ করিলেন।

বিবাহের পর কুন্দের চিত্তে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলেও তাহা প্রবল হইতে পারে নাই। সেইজন্য আকাঙ্ক্ষার প্রভাবে তাহার অন্তঃকরণ নীচ হয় নাই। যে পুরুষের প্রতি তাহার চিত্ত যৌবনের প্রারম্ভ হইতে আকৃষ্ট হইয়াছিল, সেই পুরুষকে স্বামীরূপে পাইয়া কুন্দ কেবল তাহার ভালবাসা পাইবার আশা করিয়াছিল। যদি তাহার চিত্তে সকল প্রকার সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা জন্মিত, তাহা হইলে বিবাহের পরদিন হইতে কুন্দের প্রকৃতির

পরিবর্ত্তন দেখা যাইত। তাহার শান্ত-নম্র প্রকৃতি ক্রমশঃ উগ্র ও মুখর হইয়া উঠিত। তখন কোন ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইলে, সে আপন অধিকার দেখাইয়া তাহা পাইবার জন্য জোর করিত। গৃহিণীর অধিকার পাইয়া সে সেই সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিবার চেষ্টা করিত।

যদি কুন্দনন্দিনীর প্রকৃতি সাধারণ স্ত্রীলোকের মত হইত, তাহা হইলে নগেন্দ্রের অনুরাগ ও মোহ দেখিয়া সে বিবাহের পরদিন হইতে তাঁহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিত। দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী স্ত্রী যেরূপ সোহাগ আদর বিরক্তি অভিমান, রোষ দ্বন্দ্ব দ্বারা স্বামীকে আপন করতলগত করিবার চেষ্টা করে, কুন্দও নগেন্দ্রের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিত। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যেরূপ স্বামীর কোন অন্যায় ব্যবহার দেখিলে কর্কশ-বচনে তাহার লাঞ্ছনা করে, কুন্দ প্রকৃত নীচমনা হইলে স্বামীর বিরক্তির লক্ষণ দেখিয়া মুখরার ন্যায় অপ্রিয় কথা বলিতে এবং পূর্ব্ব-অনুরাগ ও আগ্রহ স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিত। কিন্তু কুন্দ তৎপরিবর্ত্তে বিনা দোষে ভর্ৎসিত হইয়া কেবল কাঁদিত—স্বামীর সম্মুখে মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিত না। কুন্দ কখনও স্বামীর কথার প্রতি উত্তর করিতে পারে নাই এবং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও আপন অভিমত প্রকাশ করে নাই। সেইজন্যই নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর প্রতি অনাসক্তি দেখাইয়া এত সহজে গৃহত্যাগ করিয়া সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানে বাহির হইতে পারিয়াছিলেন।

কুন্দ এরূপ নম্র ছিল যে,অন্যের স্বেচ্ছাকৃত ব্যবহারের জন্য যখন তাহাকে দারুণ মনোকষ্ট পাইতে হইত, তখন সে অন্যকে কষ্টের কারণ স্থির না করিয়া আপন অদৃষ্টদোষে এইরূপ হইতেছে মনে করিত। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের জন্য এ জীবনে তাহার এত দুঃখভোগ ঘটিতেছে মনে করিতে পারায়, সে ধীরভাবে সকল দুঃখ সহ্য করিতে পারিত। এই বিনীতভাব

ও অসীম সহ্যগুণের জন্য নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানে বিফলমনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কুন্দের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া সেই গৃহে থাকিতে সাহস করিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রের গৃহত্যাগের পর হইতে কুন্দ স্বামীর ভালবাসা পাইবার আশা ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে দেখিবার আশা সে কখনও ত্যাগ করিতে পারে নাই। সেইজন্য নগেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে সে অত্যন্ত কষ্ট-বোধ করিত। আপনার দুঃখ সে সহ্য করিতে পারিত। কিন্তু সেই অন্যের দুঃখের কারণ হইয়াছে এবং তাহারই জন্য এই সুখের সংসার ছারখার হইয়াছে, এই আত্মচিন্তা ও অন্যের এইরূপ অভিমত তাহার দুঃখ অসহ্য করিয়া তুলিল। দুঃখে জর্জ্জরিত হওয়ায় তাহার সেই সুন্দর দেহ জীর্ণ ও শুষ্ক হইল। তাহার লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি রূপান্তরিত হইয়া দুঃখের প্রতিচ্ছবি হইয়া উঠিল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাহার প্রতি বিদ্বেষাপন্ন হইতে পারিত না। সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর হইতে যে কমলমণি কুন্দের মুখদর্শন করিতেন না, তিনিই এখন কুন্দের শীর্ণ ক্লিষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া আর বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারিলেন না। কুন্দের অন্তরে সুখোৎপাদনের জন্য কমল চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তাহার মুখে হাসি দেখিবার জন্য নগেন্দ্রের আগমন-বার্ত্তা জানাইলেন।

স্বামীকে দেখিবার জন্য কুন্দ জীবন-ধারণ করিয়াছিল। যখন কমলের নিকট তাঁহার আসিবার কথা শুনিল, তখন কুন্দ ঈষৎ আনন্দ প্রকাশ করিল, কিন্তু অন্তরে সে যে অপার আনন্দ অনুভব করিল, তাহার ধারণা কেহ করিতে পারিল না। যখন কুন্দ সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ শুনিল, তখন সে কাঁদিল। সে ভাবিত, সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলে একবার তাঁহাদের ভাল করিয়া দেখিয়া এ জীবন ত্যাগ করিবে। সূর্য্যমুখীর সুখের পথ রোধ করিতে এবং সে সুখের সংসারে দুঃখের কারণ হইয়া থাকিতে

কুন্দ আর ইচ্ছা করিত না। সুতরাং তাহার এ সাধ পূর্ণ হইল না বলিয়া কুন্দ কাঁদিল। সূর্য্যমুখী তাহাকে বালিকা বয়স্ হইতে যত্ন ও আদরে লালন পালন করিয়াছিলেন, সেই আদর যত্ন স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে কুন্দ কাঁদিল। যে সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানের জন্য স্বামী গৃহত্যাগ করিয়া পথে পথে বেড়াইয়াছেন এবং যাঁহাকে দেখিতে না পাওয়ায় তিনি দুঃখিত-অন্তঃকরণে গৃহে ফিরিতেছেন, স্বামীর সেই দুঃখ অনুভব করিয়া কুন্দ কাঁদিল। যে মহৎ পতিপ্রেমোন্মত্ত হৃদয়ের জন্য সূর্য্যমুখী স্বামীর সুখ কামনা করিয়া অন্যা স্ত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া নিজে সর্ব্বসুখ বর্জ্জিতা হইয়াছিলেন, সেই পতিপ্রাণাকে স্মরণ করিয়া কুন্দ কাঁদিল।

যদি কুন্দ সাধারণ স্ত্রীলোকের মত হইত, তাহা হইলে সপত্নীর মৃত্যুতে সে দুঃখানুভব করিত না। যদি তাহার চিত্তে জাগতিক ভাব অধিক থাকিত এবং বাসনা-মূলক প্রণয় দ্বারা তাহার চিত্ত স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হইত, তাহা হইলে সে স্বামীর অদর্শন সহ্য করিতে পারিত না। বিবাহের পরে তাহার অনাসক্ত হৃদয়ের পবিত্র প্রেম মোহযুক্ত প্রণয়ে পরিণত হইবার অবসর পায় নাই বলিয়াই স্বামীর অদর্শন সে সহ্য করিয়াছিল এবং সেই জন্য স্বামী গৃহে আসিয়াছেন শুনিয়াই ছুটিয়া তাঁহার নিকট যায় নাই।

নগেন্দ্রনাথ গৃহে আসিয়া কুন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না এবং কুন্দও স্বামীর নিকট গেল না। এরূপ দুঃখ-কষ্টের সময় কি ভাবে কথা কহিতে হয়, তাহা কুন্দ জানিত না; কিরূপ কথা বলিলে সান্ত্বনা দেওয়া হয়, তাহা কুন্দ বুঝিত না। মর্ম্মাহত নগেন্দ্রনাথ এরূপ সময় তাহার দর্শন সহ্য করিতে পারিবেন কি না, এ সন্দেহ তাহার হইল এবং যদি তিনি সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রথম কি কথা তাঁহাকে বলিতে হইবে, তাহা কুন্দ স্থির করিতে পারিল না। স্ত্রীজনসুলভ জড়তা ও লজ্জা তাহার গতি-শক্তি লোপ করিল, চিত্তের সারল্য ও ভীতিভাব তাহার বিবেচনা লোপ করিল। তখন

কুন্দ স্বামিদর্শন-লালসায় আপন প্রকোষ্ঠে বসিয়া উন্মুক্ত দ্বার-দেশ-প্রতি চাহিয়া রহিল।

যত রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, ততই কুন্দের চিত্তে নৈরাশ্য আসিতেছিল। অবশেষে আশাহত হইয়া কুন্দ কাঁদিতে লাগিল। তাহার গভীর শোক অবিরত অশ্রুক্ষরণে প্রকাশ পাইল। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া কুন্দ আপনার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুনয়নে জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই নয়নাসারে কুন্দের বসন ও উপাধান সিক্ত হইল।

যে স্বামীর দর্শন ও স্নেহের আশায় কুন্দ জীবন-ধারণ করিয়াছিল, যে স্বামীর চিন্তা করিয়াই অপার আনন্দ পাইত এবং যাঁহার অনুগ্রহে সংসারে স্বর্গসুখ ভোগ করিবার আশা করিয়াছিল, কুন্দ সেই স্বামীর দর্শনমাত্রেও বঞ্চিত হইয়া নিদারুণ যাতনা অনুভব করিল। স্বামী তাহাকেই সকল অনর্থের মূল স্থির করিয়া রুষ্ট হইয়াছেন এবং এখনও ক্ষমা করিতে পারেন নাই মনে হওয়ায়, যন্ত্রণা মরণাধিক বোধ হইল। সে যে স্বামীর চিত্তে আনন্দোৎপাদনে অসমর্থ হইয়া কষ্টের কারণ হইয়াছে—ইহা মনে করিয়া সেই পতিপ্রাণা স্ত্রী অন্তরের সহিত মৃত্যুকে আহ্বান করিল। তাহার প্রেমভক্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রতিদানস্বরূপ কঠোরতা ও স্নেহমমতাশূন্য ব্যবহার পাওয়ায় তাহার মর্ম্মচ্ছেদ হইল। তাহার কোমলহৃদয় নগেন্দ্রের ব্যবহারে শেলবিদ্ধ হওয়ায়, কুন্দ মৃত্যুকেই একমাত্র শান্তি-সুখপ্রদ বলিয়া স্থির করিল। সমস্ত রাত্রি তাহার চিত্ত দুঃখে সংক্ষুব্ধ হইল।

রাত্রিশেষে তন্দ্রাবেশে কুন্দ স্বপ্ন দেখিল যেন তাহার মাতা পুনরায় তাহার সম্মুখে আসিয়াছেন। তখন পূর্ব্বস্বপ্নবৃত্তান্ত কুন্দের স্মরণ হইল। এ সংসারে তাহার ভাগ্যে কোন সুখ নাই দেখিয়া কুন্দ অতি কাতর হইয়া সেই স্বপ্নদৃষ্টা মূর্ত্তিকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা, তুমি আমাকে সঙ্গে

লইয়া চল। আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না।” মাতা সম্মতি প্রকাশ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন কুন্দ ভগবানের নিকট অকপট-হৃদয়ে প্রার্থনা করিল, যেন এ স্বপ্ন সত্য হয়, যেন আর তাহাকে এ সংসারে থাকিয়া দুঃখভোগ না করিতে হয়। কুন্দ প্রার্থনা করিল, যেন সে অবিলম্বেই এ ক্লেশপূর্ণ জগৎ ছাড়িয়া চিরসুখময়, চিরশান্তিময় রাজত্বে চলিয়া যাইতে পারে।

কুন্দের কাতর প্রার্থনা ভগবান শুনিলেন। মৃত্যুদূত আপনা হইতে কুন্দের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাতঃকালে হীরা আসিয়া কুন্দের সম্মুখে বিষের কৌটা রাখিল, এবং বলিল যে, স্বামী কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত জীবন ধারণ করা অপেক্ষা আত্মহত্যা করিয়া তাহার অবসান করা অনেক ভাল। কুন্দ বিষপান করিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সকল জ্বালা হইতে উদ্ধার-লাভ করিল।

নগেন্দ্রদত্তের ভবনে যখন এক প্রকোষ্ঠে নগেন্দ্রের সহিত সূর্য্যমুখীর মিলন হওয়ায় আনন্দধ্বনিতে গৃহ মুখরিত হইতেছিল, তখন অন্য প্রকোষ্ঠে কুন্দনন্দিনী আপন অভিশপ্ত জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য একাকিনী মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেছিল। এ জীবনে কুন্দ কোন অপরাধ করে নাই; এমন কোন মহাপাপ করে নাই, যাহার জন্য তাহাকে এই জীবনব্যাপী দুঃখভোগ করিতে হইল। তাহার একমাত্র দোষ এই যে সে কথা কহিতে পারিত না। আপনার মনোভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে পারিত না এবং নিজের গুণের পরিচয় দিত না। সেই জন্যই কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না; সেই জন্যই এ সংসারে তাহাকে অনন্ত দুঃখ-ভোগ করিতে হইল।

যখন সূর্য্যমুখী সুখের সংসারে প্রবেশ করিলেন, তখন কুন্দনন্দিনী

সংসার হইতে অন্তর্হিত হইল। আমরা দেখিলাম, যখন বহুভাষিণী, আত্মপ্রকাশ-তৎপরা সূর্য্যমুখীর অভ্যুদয় হইল, তখন অল্পভাষিণী, মৌন-প্রকৃতি-শালিনী কুন্দনন্দিনীর অধোগতি হইল। যখন প্রণয়শালিনী প্রেম-প্রকাশ-সমর্থা, উদারচেতা সূর্য্যমুখী সাদরে গৃহীতা হইলেন, তখন প্রেমপূর্ণ-হৃদয়া প্রেম-পরিচয়-দানে অনভ্যস্তা পবিত্র কুন্দনন্দিনী পরিত্যক্তা হইল। যখন নগেন্দ্রের জীবনসমুদ্রে সূর্য্য উদিত হইল, তখন কুন্দ আপনা হইতেই ঝরিয়া পড়িল। কুন্দনন্দিনীর জীবিতাবস্থায় কাহারও চিত্ত তাহার প্রতি স্থায়ীভাবে আকৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু মৃত্যুর পর সকলেই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সহানুভূতির সহিত সেই মৌন পবিত্র রমণীর চিন্তা করিত। কপট, আড়ম্বরপূর্ণ এই সংসারে নির্ব্বাক্ মহত্ত্বের এবং মৌনকর্ম্মের লাঞ্ছনা ও অবমাননার নিদর্শন সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান।

সমাপ্ত